আমি অত্যন্ত খুশি যে,
সারা দেশে এ দৃশ্য কোথাও
দেখিনি : গান্ধীজী
— পৃঃ ২০

স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ,
বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর
নতুন আঘাত—পৃঃ ১৭

৭০ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা।। ১২ মার্চ ২০১৮।। ২৭ ফাল্গুন - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com

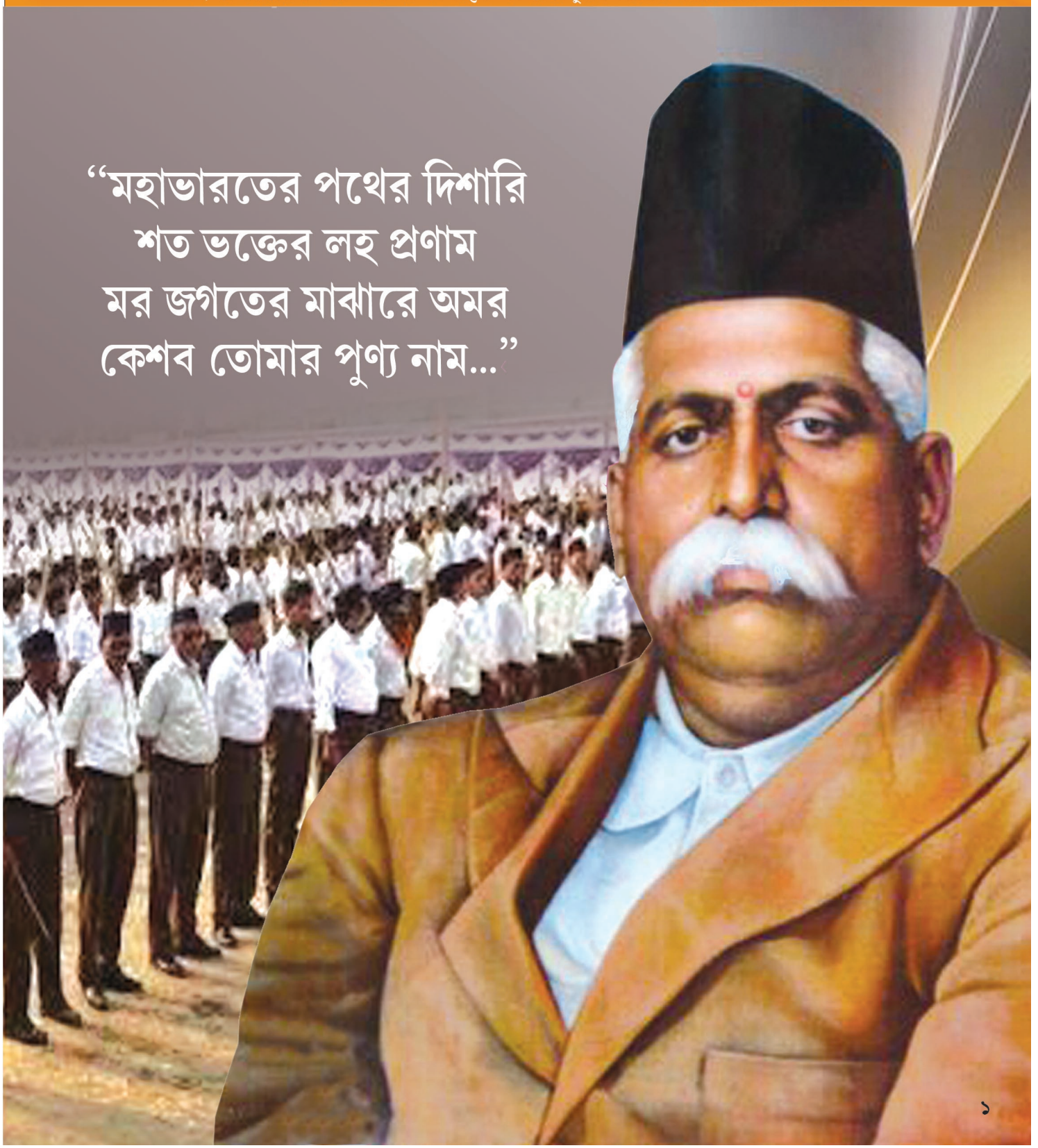

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ২৯ সংখ্যা, ২৭ ফাল্গুন, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১২ মার্চ - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

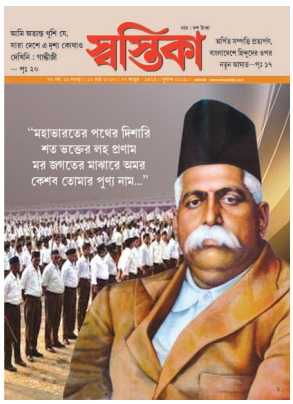

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

কেন্দ্রবিরোধী রাজনীতিতে খর্ব হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো
□ কে এন মণ্ডল □ ১০

খোলা চিঠি : মুখ খুললেই দিদি ভারতী করে দেবেন
□ সুন্দর মৌলিক □ ১১

ডা: হেডগেওয়ারের হিন্দু রাষ্ট্রভাবনা চিরকালীন
□ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ১২

সঙ্ঘের দৃশ্যমান রূপ ডাক্তারজীর ভাবনার ফসল
□ বিদ্রোহী কুমার সরকার □ ১৪

মতবাদের দৈন্যতার কারণেই বামপন্থীরা আজ বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি □ গৌতম মুখোপাধ্যায় □ ১৫

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নতুন আঘাত □ ১৭

'আমি অত্যন্ত খুশি যে, সারা দেশে এ দৃশ্য দেখিনি' □ ২০

প্রধানমন্ত্রীর প্রচারমাধ্যম সংক্রান্ত সমস্যাটা বাড়ছে
□ তভলিন সিংহ □ ২৭

'প্রভু নিত্য আছ জাগি' □ সারদা সরকার □ ৩১

বেদের সারমর্ম □ রবীন সেনগুপ্ত □ ৩২

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত
□ সলিল গেঁউলি □ ৩৩

ফাল্গুন মাসের কৃষিকর্ম □ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এই সময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ □ **চিঠিপত্র : ২৯-৩০** □ **সুস্বাস্থ্য: ৩৭** □ **অন্যরকম : ৩৮** □ **স্মরণে : ৩৯** □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র

ভারতবর্ষের জাতীয় নায়ক রাম। নানা ভাষা, নানা মত এবং নানা পরিধানে সমৃদ্ধ একটি দেশকে প্রথম জাতীয়তার একসূত্রে বেঁধেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, ভারতের প্রাচীন জনগোষ্ঠীগুলির সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের কাজও শুরু হয়েছিল তাঁরই নেতৃত্বে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। থাকবে শ্রীরামচন্দ্রের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সাম্প্রতিক কিছু প্রমাণ এবং ভারতবর্ষের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় নির্মাণে তাঁর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা। লিখবেন ড. তুষারকান্তি ঘোষ এবং সন্দীপ চক্রবর্তী।

দাম একই থাকছে — ১০.০০ টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

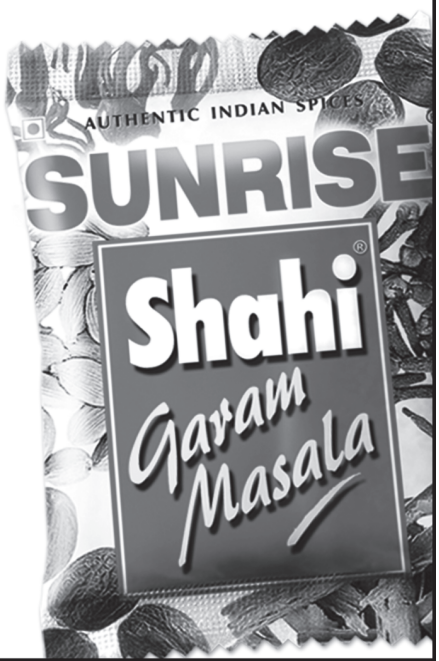

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণচুমি

সাম্প্রতিক ত্রিপুরার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বিপুলভাবে জয়লাভ করিয়াছে। তাহাদের এই সাফল্যকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক আঙ্গিক হইতে দেখিলে অনুচিত হইবে। সমাজবিজ্ঞানীরা আশ্চর্য হইয়াছেন বিগত বিধানসভা নির্বাচনে যে দলের ঝুলিতে দেড় শতাংশের অধিক ভোট ছিল না, লোকসভা ভোটে প্রবল মোদী হাওয়ার মধ্যেও যাঁহারা পাঁচ শতাংশের অধিক ভোট জুটাইতে পারেন নাই, তাঁহারা কোন মন্ত্রবলে অর্ধেকের অধিক নাগরিকের ভোট পাইয়া এত কম সময়ে ক্ষমতাসীন হইলেন? ইহার ইতিহাস সুদীর্ঘ। ১৯৯৯ সালের ৬ অগস্ট যেদিন খ্রিস্টান লবির মদতপুষ্ট জঙ্গিরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের চার কার্যকর্তা—শ্যামলকান্তি সেনগুপ্ত, দীনেন দে, সুধাময় দত্ত ও কাঞ্চন চক্রবর্তীকে অপহরণ করিয়াছিল এবং তাহার দুই বৎসর বাদে যখন ইঁহাদের রক্তে ত্রিপুরার মাটি রঞ্জিত হইবার সংবাদ আসিয়াছিল, সেইদিন হইতে ভারতমাতাকে রক্ষা করিবার শপথ লইয়াছিলেন একদল মানুষ। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন আর কোনও ভারতমাতার বীর সন্তানের রক্তে ভারতভূমি ত্রিপুরাকে রঞ্জিত করা চলিবে না।

কিন্তু তাহাতেও হামলা থামে নাই। গত দুইদশকে এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন বারংবার হইতে হইয়াছে, যাহাতে ত্রিপুরার মাটিকে রক্তে সিঞ্চিত হওয়া হইতে আটকানো যায় নাই। সমাজ পাল্টাইতেছিল সমাজবেত্তারা ইহা বুঝিতে পারেন নাই। 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি', 'মণিপুর মাঙ্গে আজাদি' আওয়াজ তুলিয়া যাহারা লম্ফঝম্প করিয়া কিছু সংবাদমাধ্যমের পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়াছিলেন, এই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যে ক্রমশ সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, তাহা সমাজবিদদের বোঝানো যায় নাই। তাঁহারা সমাজবিদের তকমা স্বীয় গাত্রে আটকাইয়া মার্কসবাদের সহিত ভারতীয় সমাজকে গুলাইয়া কোনও দুরূহ তত্ত্ব আবিষ্কারে ব্যস্ত ছিলেন। উত্তর-পূর্ব ভারতকে ভারতবর্ষ হইতে ছিন্ন করিতে এই তত্ত্ব- প্রণেতারা চেষ্টার কসুর করেন নাই। কিন্তু একথা তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক জাগরণ তো ক্ষণকালের বিষয়। সামাজিক জাগরণ না হইলে রাজনৈতিক জাগরণের মূল্য থাকে না।

দিনের পর দিন দেশাত্মবোধের পূজারিরা পৌঁছাইয়াছিলেন জনজাতি মানুষের গৃহে, তাহাদের বুঝাইয়াছিলেন ভারতবর্ষ তাহাদেরও দেশ। ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় আর্য-অনার্যের গল্পগাথা একদল স্বার্থান্বেষী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর সৃষ্টি। কারণ এদেশে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ না বাধাইলে, ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের রণডঙ্কা না বাজাইলে ভারতকে টুকরা করিবার ষড়যন্ত্র যে মাঠে মারা যাইবে! একথা উপলব্ধি করিতে জনজাতিদের বিলম্ব হয় নাই। তাই গোটা উত্তর-পূর্ব ভারত একজোট হইল, সামাজিক জাগরণের কাঙ্ক্ষিত ফল রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করিল। দেশদ্রোহীরা যখন দেখিল জনজাতিদের আর বোকা বানানো যাইতেছে না, তখন তাহারা নূতন রূপ ধারণ করিল।

বাঙালির আবেগ লইয়া শুরু হইল নূতন ক্রীড়া। বাঙালি খেদাওয়ের জুজু দেখানো হইল, আরবের সহিত তাহাদের ভ্রাতৃত্বের মাধুরী পর্যন্ত রচিত হইল, অবাঙালিদের উপর বিদ্বেষ তৈরিতেও চেষ্টার ত্রুটি হইল না। কিন্তু এইবারও দেশদ্রোহীদের নিদারুণ ভাগ্য বিপর্যয়। পশ্চিমবঙ্গের বাহিরের বাঙালি সারা ভারতবর্ষের সহিত একাত্ম বোধ করিল। ফলত কুলার বাতাস দিয়া দেশদ্রোহীদের বিদায় করিতে প্রথম অসম, পরে ত্রিপুরাবাসী সময় নেন নাই। মজার ব্যাপার হইল, বিচ্ছিন্নতাপন্থী দেশদ্রোহীরা আজ বিজেপির বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দিবার অভিযোগ তুলিতেছে, কারণ আঞ্চলিক শক্তিগুলির সঙ্গে তাহারা জোট করিয়াছে; অথচ আঞ্চলিকতাবাদকে আশ্রয় করিয়া ইহারাই একদিন দেশদ্রোহিতার বিষবৃক্ষ বপন করিয়াছিল। এতদিনে সেই বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটন হইয়াছে, আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদকে নির্মূল করিয়া সারা দেশের সহিত তাহাদের একাত্ম করিয়া। ইহাতেই গাত্রদাহ বামপন্থী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের। তাঁহারা মায়া ক্রন্দনে নিমগ্ন থাকুন, দেশ হাসিবে। ত্রিপুরায় জাতীয়তাবাদীদের এই জয় প্রমাণ করিল যে, সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের আদর্শ অমর। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরা জয়ের অব্যবহিত পরেই সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া দেশবাসীকে সেই বার্তাই প্রদান করিলেন।

সুভাষিতম্

পাত্রে ত্যাগী গুণে রাগী ভোগী পরিজনৈঃ সহ।

শাস্ত্রে বোধা রণে যোধা নৃপতেঃ পঞ্চলক্ষণম্।। (চাণক্যনীতি)

সৎপাত্রে দান, গুণের প্রতি অনুরাগ, পরিজনের সঙ্গে ভোগ; শাস্ত্রে জ্ঞান এবং রণকৌশলে দক্ষতা—এই পাঁচটি রাজার প্রশস্ত লক্ষণ।

লুটিয়েনি সাংবাদিকদের মুখে ঝামা

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়॥ প্রবীণ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার তথা রাজ্যসভা সদস্য স্বপন দাশগুপ্ত প্রায়শই একটা বিষয়ে জোর দেন তা হলো 'লুটিয়েন্স দিল্লি'। অতি পরিচিত টিভি চ্যানেল সঞ্চালক অর্ণব গোস্বামীর রাজনৈতিক বিতর্ক সভাগুলি পরিচালনার সময়ও এই 'লুটিয়েন' বারবার আলোচিত। এই দু'জনের মতেই এটি একটি বিশেষ গোষ্ঠীকেন্দ্রিক আচরিত ঘরানা। খোঁজ নিলে

দেখা যায় তদানীন্তন ভাইসরয়দের জমানায় Edwin Lutyen ছিলেন (১৮৬৯-১৯৪৪) নব্য দিল্লির অতি প্রশস্ত বাংলো প্যাটার্নের বাড়িগুলির অন্যতম নকশাকার। এই অঞ্চলেই নিবাস রাজনৈতিক ক্ষমতার মূল অংশীদারদের। রাষ্ট্রপতি থেকে প্রধানমন্ত্রী ও পদমর্যাদা অনুযায়ী বহু মন্ত্রীর বসবাস এখানে। সাংবাদিককুলের একটা বড় অংশেরও এঁদের কাছে নিত্য যাতায়াত করার বরাবর রেওয়াজ ছিল। সেই সুবাদে ক্ষমতার অলিন্দে ঘোরাফেরা করতে করতে তাঁরা অনেকেই বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘদিনের ক্ষমতাবান প্রভুদের মনপসন্দ কিছু কিছু বদ্ধমূল পূর্বনির্ধারিত ধারণা তৈরি করে ফেলেন। দেশের যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পর্যালোচনাকারী সাংবাদিক বা ভাষ্যকার হিসেবে তাঁরা এই মনগড়া পছন্দসই বক্তব্য চ্যানেলের মাধ্যমে দর্শকের মনে চাউড় করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এরই আর এক নাম 'লুটিয়েনি মূল্যায়ন'।

কিন্তু বড় ধরনের উত্থান-পতন সংবলিত রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সম্প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ করে নির্বাচনী ফলাফলের অনিশ্চয়তার দিন প্রায়শই এঁদের ছদ্ম নিরপেক্ষতার মুখোশটি আজকাল নিঃসাড়ে খসে পড়ছে। গুজরাটের ফলাফলের ক্ষেত্রে মাঝ রাস্তায় একবার কংগ্রেস গোটা চারেক সিট এগিয়ে যেতেই রাজদীপ সরদেশাই উল্লসিত হয়ে বলেছিলেন 'আভি উলটি গিনতি শুরু

হোগয়ি'। অর্থাৎ বিজেপি হারতে চলেছে। আরও লাগামছাড়া সব মন্তব্য আসতে শুরু করেছিল।

ত্রিপুরা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিনও এর কোনও ব্যত্যয় হলো না। নাম উল্লেখ করে বলা দরকার, কেননা দর্শক-শ্রোতাদের এদের চিনতে পারলে নিজেদের বিশ্লেষণটি যথাযথ হতে পারে। প্রায় সব চ্যানেলেই exit poll-এ ত্রিপুরায় বিজেপি'র জয়ের আগাম আভাস দেওয়ায় হয়েছিল। বিভিন্ন দলীয় মুখপাত্রদের কথা এখানে আলোচ্য নয়, কিন্তু রাজনৈতিক ভাষ্যকার বা নিরপেক্ষ সাংবাদিকের ভেক নিয়ে যাঁরা থাকেন তাঁদের কাছেই মানুষ ঠকে যান। এই ভাষ্যকাররা আগে থেকেই কিছুটা মনমরা থাকায় এবং প্রারম্ভিক Postal ballot-এর সূচনা সঙ্কেত পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক শুরু হওয়াতে তাদের মন আরও মেঘলা হতে থাকে। কিন্তু সাড়ে দশটা নাগাদ হঠাৎ সিপিএম ৩৩, বিজেপি ২৬ হওয়াতে এমনই এক বামমার্গী তথা কংগ্রেসী-লুটিয়েনি সাংবাদিক সাবা নাকভি অত্যন্ত মহানুভব হয়ে জানান— পিছিয়ে গেলেও বিজেপি শূন্য থেকে যে লড়াই শুরু করে এতদূর এসেছে তার জন্য বাহবা দিতেই হবে। তাঁর মনে অজান্তেই প্রফুল্লতা সঞ্চারিত হওয়ায় তিনি ধরেই নেন বিজেপি হেরেই যাবে। বহু নির্বাচন আসবে, এঁরাও স্টুডিও আলো করে পসরা নিয়ে বসবেন, কিন্তু আমাদের সতর্ক হতে হবে। এঁদের গোপন এজেন্ডা ছাড়াতে আরও এক দশক লাগবে।

ফলাফল বিশ্লেষণ বিশেষজ্ঞরা করবেন। ওই দিনের আরও কয়েকটি আনুষাঙ্গিক দিকে নজর দেওয়া দরকার। 'রিপাবলিক' চ্যানেলে বিজেপি-র মুখপাত্র ছিলেন স্বভাবত মৃদুভাষী জি ভি এল নরসিমহা রাও। এমন অভ্রান্ত জ্যোতিষবাণী শুনে তিনি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলেন— ''দেখুন, এই সাড়ে দশটা থেকে এক ঘণ্টা কিন্তু অত্যন্ত 'ডেঞ্জারাস আওয়ার'। সদ্য সব ইভিএম খোলা হয়েছে। এসময়টি কিন্তু টালমাটাল। বিহারে এসময় আমরা জিতে গিয়েছিলাম। এক ঘণ্টা পর থেকেই আমাদের পতন শুরু হয়।'' বাকিরা নরসিমহার কথা হালকা ভাবেই নিয়েছিল। কিন্তু তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলেছিল। আর একজনের আসন সংখ্যা অভ্রান্তভাবে মিলিয়ে দেওয়া বিস্ময়কর বললে যথেষ্ট বলা হবে না। তিনি হিমন্ত বিশ্বশর্মা, North East Development Authority তৈরির যিনি অন্যতম রূপকার। দীর্ঘদিন নির্বাচনী রাজনীতির কূট হিসেব নিকেশ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অর্জন সহজ নয়। সকাল ১১টায় যখন বিজেপি ৩২ ছিল তখনই আসন ৪৫-এর কাছাকাছি যাবে বলে তিনি মেঘালয় চলে যান। সকলেই দেখেছেন বিজেপি ৪৩টি আসন জিতেছে। ফলিত নির্বাচনী রাজনীতি একটি পুরো সময়ের চর্চার বিষয় একথা বিজেপি সভাপতি অনেক আগেই বলেছিলেন। হিমন্ত তাঁর ছত্রছায়ায় তা করে দেখাচ্ছেন। নাগাল্যান্ডে হঠাৎ পৌঁছে খ্রিস্টানদের সঙ্গে ব্যান্ড বাজিয়ে, বিজেপি এলে

সব চার্চ পুড়িয়ে দেওয়া হবে বলে দুম করে নানির সঙ্গে ইতালিতে হোলি খেলতে চলে গেলে তো চলবে না। সেটা তো নিতান্তই 'বাবুসোনা' সুলভ কাজ। ভোটযুদ্ধ যুদ্ধই। নির্বাচনী রাজনীতি চর্চার যে কথা বলা হলো তার কিন্তু দু'টি দিক আছে। বাংলায় সিপিএম তার কদর্য দিকটিতেই প্রবাদ প্রতিম দক্ষতা অর্জন করে ৩৪ বছর কাটিয়ে গেছে। ত্রিপুরামাণিক্যও যে গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই অপরাজেয় হয়ে উঠছিলেন তা অনেকেরই জানা ছিল না। জানালেন বিজেপির মহারাষ্ট্র থেকে আগত উচ্চ শিক্ষিত কর্মকর্তা সুনীল দেওধর। দেওধর ১৯৯০ থেকে ৮ বছর মেঘালয়ে কাজ করেন। শিখে নেন সেখানকার ভাষা, মিশে যান উত্তর পূর্বের মানুষজনের সঙ্গে। পালটে ফেলেন খাদ্যাভ্যাস। ২০১৪ সালে নিয়েছিলেন রাজসূয় যজ্ঞের ভার। প্রধানমন্ত্রীর বারাণসী কেন্দ্রের কর্তা হয়ে তাঁকে জিতিয়ে আনেন। ত্রিপুরা নির্বাচনের ৫০০ দিন আগে আবার ত্রিপুরার দায়িত্ব পড়ে। শেখেন 'ককবরক' উপজাতি ভাষা। দল এস টি সংরক্ষিত ২০টি উপজাতি আসনই জিতেছে। সুনীল জানাচ্ছেন, তিনি মানিক সরকারকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সকাল বারোটা অবধি ত্রিপুরায় ২৫ শতাংশ ভোট পড়ত। পাঁচটায় সেটা ৯০ শতাংশে পৌঁছে যেত। আরও ভয়ঙ্কর তথ্য দিয়েছেন তিনি। ৪০ কিলোমিটার পথও মানিকবাবু হেলিকপ্টার ছাড়া যেতেন না। তাঁর এতই সাধাসিধে জীবন ছিল যে হেলিকপ্টার ভাড়া ওইটুকু রাজ্যে বহু কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সুনীল শুধু বিজেপির আসনই বাড়াননি, সততার মুখোশটিও এক টানে খুলে দিয়েছেন। হ্যাঁ, যখন তিনি হেলিকপ্টার ভ্রমণ করেছেন তখন মোদীজী ২০১৪-এর পর ত্রিপুরায় ট্রেন চালু করে দিয়েছিলেন। তবুও তিনি ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে না গিয়ে হেলিকপ্টার যোগে ত্রিপুরাব্যাপী মার্কস, স্টালিনের জন্মদিন ধুমধাম করে পালন করতেন। মার্কসবাদীদের কথাবার্তা মানুষ সব শুনেছেন। সময়ে জবাব দেবেন। তাই হয়তো দিলেন। রামমাধব কিন্তু ঠিক জায়গাটা ধরেছিলেন। কথা শুরু করেই বলছেন, মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীকা কৃপামেঁ সব হুয়া।

যাই হোক, রাজ্যগুলি ছোট হলে কী হবে ভারতবর্ষের জাতিগত ভারসাম্য বদলে দেওয়ার যে গভীর চক্রান্ত চলছিল তাতে ইতি পড়ল। বিজেপি এলে গোরু খাওয়া যাবে না, সব চার্চ পুড়ে যাবে, খ্রিস্টানদের ওপর নির্যাতন মাত্রা ছাড়াবে এসব আতঙ্ক ছড়ানো মিথ ৯৫ শতাংশ খ্রিস্টান অধ্যুষিত নাগাল্যান্ড ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। বিজেপি ২০টি আসনে লড়ে জিতেছে। সাফল্যের হার ৬০ শতাংশ। ভোট ভূতে দেয়নি। প্রভু খ্রিস্টের অনুগামীরাই দিয়েছে। খুলে গেছে পুবের বন্ধ দুয়ার।

এই জয়ে অভিভূত মোদীজী স্মরণ করেছেন সঙ্ঘ ও দলীয় কাজে ত্রিপুরায় নিহত শহিদদের। আমাদের মনে পড়ে দীনেন দে, শ্যামল সেনগুপ্ত, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, সুধাময় দত্তের হাস্যোজ্জ্বল মুখচ্ছবি। এঁরা ১৯৯৯-এ ত্রিপুরায় অপহৃত হয়ে যান। মায়ানামারে নিয়ে গিয়ে এঁদের খুন করা হয়। শহিদের রক্ত বৃথা যায়নি। তবে নতুন রক্তপাত হবে না। পরাজিত, হতমান মার্কসবাদীরা বলছেন বিজেপি টাকা ছড়িয়ে ভোট জিতেছে। যাই হোক, ভারতীয় রাজনীতির আমাদের চটিপিসিরও তাই মত। ত্রিপুরায় কংগ্রেস ১.২ শতাংশ ভোট পেলেও চটিপিসি বলছেন, তাঁর সঙ্গে জোট করলে বিজেপি ১০-এ নেমে যেত। তাঁর দলের ভোট শতাংশ অবশ্য বলেননি। বিপ্লববিলাসী দুর্লভ প্রজাতি আজ উদ্বাস্তু। প্রকাশ কারাত কিন্তু কংগ্রেস না বিজেপি কে বড় শত্রু সেই ধাঁধাঁয় এখনও আচ্ছন্ন। শয্যাপার্শ্বে রক্তাক্ত বিপ্লবের বর্ণনা সংবলিত হিংস্র বইপত্র নিয়ে নৈশকালীন পড়াশোনা করা নাকি তাঁর নিত্য অভ্যাস। তাঁকে না ইয়েচুরির ওপরই বিপ্লবী প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে হয়। হায়!

নিন্দায় সরব সারা বিশ্ব
পাকিস্তানে সাংবাদিককে মারল মৌলবাদীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ফের নৃশংসভাবে খুন হলেন এক পাক- সাংবাদিক। অকুস্থল রাওয়ালপিণ্ডির ব্যাঙ্ক রোড, পাক-সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে এই ঘটনা ঘটে গত পয়লা মার্চ গভীর রাতে। পাকিস্তানের ডন সংবাদপত্র জানাচ্ছে ওইদিন একটু বেশি রাতে মোটর সাইকেলে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন বছর চল্লিশের আনজুম মুনির রাজা। এই সময় বাইকে চেপে কয়েকজন দুষ্কৃতী পথ অবরোধ করে দাঁড়ায়। এবং রাজার ঘাড়ে, মাথায়, বুকে অন্তত ছ'টি গুলি চালিয়ে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। রাজা স্থানীয় একটি প্রভাতি স্কুলের শিক্ষক এবং ইসলামাবাদ কেন্দ্রিক একটি উর্দু-পত্রিকার সাব- এডিটর। তাঁকে হত্যার পর দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। যে জায়গায় ঘটনাটি ঘটেছে, সেটি উচ্চ নিরাপত্তা জোন হিসাবে চিহ্নিত এবং ঘটনাটি ঘটার প্রায় দু-আড়াই দিন পরে তা প্রকাশ্যে আসে। এনিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে বিশ্ব জুড়ে সাংবাদিক মহলে। এমনিতে পাকিস্তানকে সাংবাদিকদের জন্য বিপজ্জনক স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছেফ্রান্স-কেন্দ্রিক সংবাদপত্র-নজরদার সংস্থা রিপোর্টারস উইথআউট বর্ডারস (আর এস এফ)। ২০১৭ সালে তারা বিশ্ব-সাংবাদিক স্বাধীনতার যে ইনডেক্স তৈরি করেছে তাতে ১৮০টি দেশের মধ্যে পাকিস্তানের স্থান ১৩৯ তম। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক কাঠামো না থাকায় সাংবাদিকরা সেদেশে নিরাপদ নন বলে সংস্থাটি তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে। সাংবাদিকরা প্রশ্ন তুলছেন হাই সিকিউরিটি জোনে দুষ্কৃতীরা বিনা বাধায় ঢুকে খুন করল কী করে? তাদের এও প্রশ্ন, সেনা-মদত ছাড়া কি সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের অতি নিকটে এই পরিকল্পিত খুন করা সম্ভব? গত এক দশকে পাকিস্তানে একশোরও বেশি সাংবাদিক খুন হয়েছেন। অথচ এনিয়ে আদালতে মামলা উঠেছে মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে। ফের এক সাংবাদিককে হত্যা করে মৌলবাদীরা 'অবাধ্য' সংবাদমাধ্যমকে বার্তা দিতে চাইল কিনা সেই প্রশ্নও উঠছে। যদিও সূত্রের বক্তব্য আনজুম রাজা মোটেও 'অবাধ্য' ছিলেন না, তবুও তার নিয়তিতেও মৌলবাদীদের হাতে হত্যার কথাই লেখা ছিল।

সামরিক শক্তিতে ভারত বিশ্বে চতুর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিশ্বের সামরিক শক্তিধর দেশের তালিকায় ভারত চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার ইনডেক্স ২০১৭ থেকে পাওয়া রিপোর্টে জানা গেছে এই তথ্য। পাকিস্তান রয়েছে ১৩ তম স্থানে। রিপোর্টে আলাদা করে একটি তুলনামূলক সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। তুলনা করা হয়েছে ভারত, চীন এবং পাকিস্তানের সামরিক শক্তির।

সূচক অনুযায়ী ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সৈন্য রয়েছেন ১৩,৬২,৫০০ জন। জম্মু ও কাশ্মীর

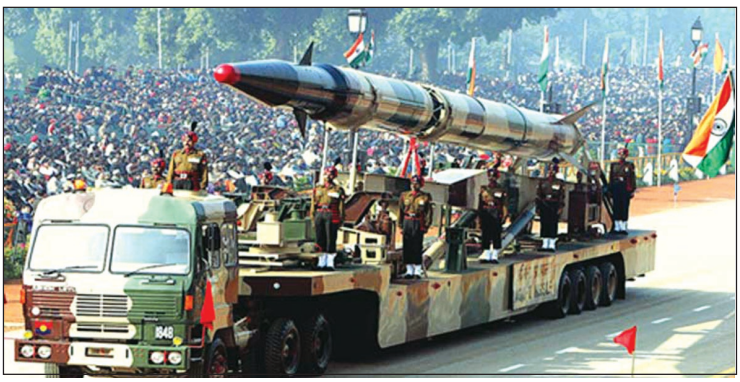

এবং উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক সীমান্তে যে দেশের সঙ্গে ভারতের দ্বৈরথ নিত্যদিন কাগজের হেডলাইন হয় সেই চীনের লাল ফৌজে রয়েছে ৩৭,১২,৫০০ জন সেনা। ভারতীয় বিমানবাহিনীর কাছে রয়েছে ২০১২টি যুদ্ধ বিমান। যার মধ্যে ফাইটার ৬৭৬টি এবং বোমারু বিমান ৮০৯টি। এছাড়া রয়েছে অন্যান্য পর্যায়ের কিছু বিমান। চীনের অস্ত্রভাণ্ডারে যুদ্ধবিমান রয়েছে ২৯৫৫টি। যার মধ্যে ফাইটার ১২৭১টি, বোমারু বিমান ১৩৮৫টি এবং চপার ২০৬টি।

ভারতীয় সেনার কাছে রয়েছে ৪৪২৬টি বিমান বিধ্বংসী ট্যাঙ্ক। ৬৭০৪টি অস্ত্রবহনকারী যানবাহন, ২৯০টি সেলফ-প্রপেলড আর্টিলারি গান এবং ৭৪১৪টি টাউড অরটিলারি গান রয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের কাছে আছে ১৯২৪টি ট্যাঙ্ক, ২৮২৮টি অস্ত্রবহনকারী যানবাহন, ৪২৬টি আর্টিলারি গান এবং ৩২৭৮টি টাউড আর্টিলারি গান। চীনের কাছে আছে ৬৪৫৭টি ট্যাঙ্ক, ৪৭৮৮টি অস্ত্রবহনকারী যানবাহন, ১৭১০টি সেলফ প্রপেলড আরটিলারি গান, ৬২৪৬টি টাউড গান। সূচক থেকে আরও জানা গেছে ভারতীয় নৌবাহিনীর কাছে যুদ্ধবিমান বহনকারী যুদ্ধজাহাজ রয়েছে ৩টি। চীনের আছে ১টি। এছাড়া ভারতের কাছে আছে ১১টি ডেস্ট্রয়ার এবং ১৫টি সাবমেরিন। চীনের রয়েছে ৩৫টি ডেস্ট্রয়ার এবং ৬৮টি সাবমেরিন। ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় ৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, চীনের ১৬১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পাকিস্তানের ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সমীক্ষায় পারমাণবিক অস্ত্র বিবেচনায় রাখা হয়নি।

ডোকলামে চীনের হেলিপ্যাড, উদ্বিগ্ন ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সিকিম-ভুটান-তিব্বতের ত্রিদেশীয় সীমান্তের কাছে ডোকলামে চীনের লাল ফৌজের তত্ত্বাবধানে আবার নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। যার মধ্যে আছে সেন্ট্রিদের পোস্ট, ট্রেঞ্চ এবং হেলিপ্যাড। এই কথা জানিয়েছেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। লোকসভায় একটি লিখিত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, '২০১৭-র ফেস অফ পরবর্তী সময়ে দু'দেশের সৈন্যদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সীমান্তে সামরিক শক্তিও অনেকাংশে কম করা হয়।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর জুন মাসে ভারতীয় সেনা চীনকে ডোকলামে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিল। চীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, চীন দক্ষিণ ডোকলামের জামফেরি রিজ পর্যন্ত একটি মোটর চলাচলের উপযোগী রাস্তা বানাবার প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। এর ফলে দু'দেশের সেনাবাহিনী ৭৩ দিন ধরে ডোকলামে একে অপরের চোখে চোখ রেখে

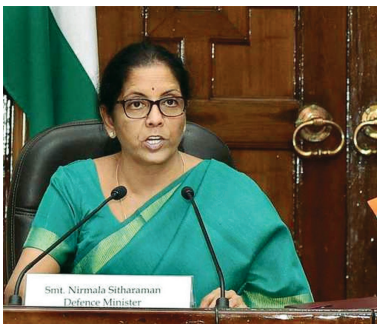

সীমান্তে পাহারা দেওয়া শুরু করে। এই ফেস অফের অবসান হয় গত বছর ২৮ আগস্ট। শীতকালে চীনের সামরিক তৎপরতা আবার শুরু হয়। সব থেকে বড়ো কথা, রীতি ভেঙে চীন শীতকালে ১৬০০ সেনা ডোকলাম সীমান্তে মোতায়েন করে।

নির্মলা সীতারামন বলেন, 'সরকার পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে।' এই নজর রাখার মধ্যে রয়েছে ৪০৫৭ কিলোমিটার ব্যাপী ভারত-চীন সীমান্তে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ-রেখা বরাবর বিস্তৃত অঞ্চলে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে কূটনৈতিক চ্যানেলগুলির মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা, দু'দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আধিকারিকদের মধ্যে নিয়মিত ফ্ল্যাগ মিটিং ইত্যাদি।

কিন্তু দেশের নিরাপত্তা ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে চীন ডোকলামে সেনাসংখ্যা আরও বাড়াতে পারে। এবং শীত বিদায় নেওয়ার পর আবার শুরু করতে পারে আস্ফালন। প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সুভাষ ভামরেও সম্প্রতি ভারত-চীন সীমান্ত পরিস্থিতি 'উদ্বেগজনক' বলে বর্ণনা করেছেন। নির্মলা সীতারামন এই প্রসঙ্গে বলেন, 'চীন তার নৌশক্তি আরও বাড়াতে চাইছে। ভারত সরকার সেটা জানে। পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে চীন ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দেশগুলিতে বন্দর তৈরি করছে। সামরিক পরিকাঠামো উন্নত করার জন্য নানা কাজ করছে। উদ্দেশ্য একটাই, ভারতকে চাপে রাখা।'

ইডির জালে কার্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি. চিদাম্বরমের ছেলে কার্তি চিদাম্বরমের বিপদ ক্রমশ বাড়ছে। সম্প্রতি রিপাবলিক টিভির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কার্তি চিদাম্বরমের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত তারা শুধুমাত্র আই এন এক্স মিডিয়া এবং এয়ারসেল-ম্যাক্সিস কাণ্ডে সীমাবদ্ধ রাখছেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রিপাবলিক টিভি সর্বোচ্চ আদালতে দাখিল করা ইডির একটি এফিডেভিট সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেছে। সূত্রের খবর, আপাতত ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন বোর্ড (এফ আই পি বি) অনুমোদিত ৫৪টি ফাইল ইডির পর্যবেক্ষণে রয়েছে। এই ফাইলগুলি কার্তি চিদাম্বরমের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এফিডেভিটের বয়ান এই রকম : 'সরকারের নীতি এবং এফ আই পি বি-র গাইডলাইন অনুযায়ী বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ৬০০ কোটি টাকার বেশি হলে অনুমোদনের দায়িত্ব ক্যাবিনেট কমিটি অব ইকনোমিক অ্যাফেয়ার্স (সি সি ই এ)-র ওপর বর্তায়। এয়ারসেল লিমিটেডের শেয়ার হস্তান্তরে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৫২০ কোটি টাকা। কিন্তু সি সি ই এ-র পরামর্শ ছাড়াই পি. চিদাম্বরম এই হস্তান্তর অনুমোদন করেন।' স্বাভাবিক ভাবেই ইডির পর্যবেক্ষণে রয়েছেন পি. চিদাম্বরমও। খতিয়ে দেখা হচ্ছে অর্থমন্ত্রী হিসেবে কী ধরনের সুযোগ তিনি সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে পাইয়ে দিয়েছিলেন।

উবাচ

যোগী আদিত্যনাথ
মুখ্যমন্ত্রী, উত্তরপ্রদেশ

"নমাজ তো রোজই পড়া হয়, হোলি বছরে একবারই হয়। তাই নমাজের সময় পিছিয়ে দিয়ে মুসলমান ধর্মগুরু ঠিক কাজই করেছেন।"

হোলি উপলক্ষ্যে নমাজের সময় পিছানো প্রসঙ্গে

কেশরীনাথ ত্রিপাঠী
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

"এখানে (পশ্চিমবঙ্গে) আচার্যের পদ নখদন্তহীন বাঘের মতো। কমিটিতে একজনকে মনোনীত করতে হলেও মন্ত্রীর পরামর্শ নিতে বাধ্য।"

ভারত চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রির এক সভায়

রবিশঙ্কর প্রসাদ
কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী

"গীতাঞ্জলি হিরে কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত-সহ সাতটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোম্পানিকে সোনা আমদানির সুবিধা পাইয়ে দিতে পি সি চিদাম্বরম ২০১৪-র লোকসভার ভোট গণনার দিন সম্মতি দিয়েছিলেন।"

হিরে কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত চোকসি প্রসঙ্গে

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

"কিছু কিছু প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার পরেও দু'একটি নমুনা খুঁজে পাওয়া যায়। কংগ্রেস বলতেই পারে একদা তাদের দল থেকেও মুখ্যমন্ত্রী হতেন। শীঘ্রই সে দলের একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী বাকি থাকবেন পুদুচেরিতে।"

উত্তর-পূর্ব ভারতের সাম্প্রতিক ভোটের ফলাফলের প্রসঙ্গে

কেন্দ্র বিরোধী রাজনীতিতে খর্ব হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো

কে. এন. মণ্ডল

ভারতীয় সংবিধান একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের অভিপ্রায় তথা ভারতরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ব্যবস্থা রেখেছে, যেখানে প্রতিটি রাজ্য নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সংবিধান নির্দিষ্ট ক্ষমতার অংশীদারিত্ব ভোগ-সহ ভারতরাষ্ট্রের সমৃদ্ধি সাধনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। অন্তঃরাজ্য কলহ নয়, কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত নয়--- প্রতিযোগিতামূলক সহযোগিতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান শক্তিশালী ভারতরাষ্ট্রের পূর্বশর্ত। এর বিপরীতে, গণতন্ত্রের নামে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির অবমূল্যায়নের দ্বারা ক্ষমতা ভোগের চেষ্টা ভারতরাষ্ট্রকে খর্ব করে।

ভারতবর্ষে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু— পশ্চিমের উন্নত দেশগুলির মতো দ্বি-দলীয়/ত্রি-দলীয় ব্যবস্থার মধ্যে সীমিত নয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। অতএব ক্ষমতার ভরকেন্দ্র বহু। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের যে স্বপ্ন সংবিধান প্রণেতারা দেখেছিলেন— বাস্তবক্ষেত্রে কদাচিৎ তা উপলব্ধ। বরং বৈচিত্র্যকে বঞ্চনার হাতিয়ার করে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার প্রবণতা সর্বত্র, বিশেষত আঞ্চলিক দলগুলি যেখানে ক্ষমতায়। ফ্রন্ট সরকার যেখানে ক্ষমতায়, প্রায়শই শরিক দলের নেতা/ নেত্রীরা ব্যক্তিগত স্বার্থে বা দলীয় স্বার্থে সরকারকে ব্ল্যাকমেল করে দেশের বা রাজ্যের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতেও কসুর করে না।

২০১৪ সালে কেন্দ্রে যখন একটি শক্তিশালী সরকার গঠিত হলো, মনে করা হয়েছিল দেশের অগ্রগতি তড়িৎগতিতে এগিয়ে আগামী এক দশকে অতীতে পিছিয়ে যাওয়া রাস্তার অনেকটাই অতিক্রম করা যাবে। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির প্রয়াস— সংসদের কাজকর্মে বাধাদান, জাতীয় স্বার্থে উত্থাপিত বিভিন্ন সংস্কারমূলক বিলে বিরোধিতা কীসের সাক্ষ্য বহন করে? এভাবেই কি রাজনীতিকরা বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্জলি যাত্রার ব্যবস্থা করে স্বৈরতন্ত্রকে আবাহনের রাস্তা বাতলে দিচ্ছেন না? ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবক্ষয়ের ধারা যেভাবে প্রবাহিত হচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতে বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। তাই সাবধানতার কথা মাথায় রাখতে হবে।

ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিকরা ক্ষমতার অপব্যবহারের দ্বারা নরমে- গরমে সংবাদমাধ্যমগুলিকে বশীভূত করে আর এর মোক্ষম অস্ত্র সরকারি বিজ্ঞাপন--- তা সংবাদপত্রে হোক বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই হোক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় এসেই বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় সংবাদপত্রগুলিকে সরকারি পাঠাগারে না রাখার সিদ্ধান্তেই সরকারের মনোভাবের আঁচ পেয়ে অনেক কাগজ সংবাদ পরিবেশনার ধাঁচ পাল্টে ফেলে। প্রতিযোগিতা শুরু হয় সরকারের তোষণে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের সংবাদমাধ্যমে হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্তের ফলে প্রধানমন্ত্রীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে প্রতিদিন সম্পাদকীয় লেখা হয় বহু কাগজে। অর্ধসত্য, ইঙ্গিতপূর্ণ, কল্পিত বা বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করে এমন একটি আবহ তৈরির চেষ্টা হচ্ছে, যেন কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ারই এক্তিয়ার নেই, তা আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেই হোক বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। আর এর সুযোগ নিয়ে আঞ্চলিক দলগুলি কেন্দ্রের অন্ধ বিরোধিতা করার সুযোগ পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, তিস্তার জলবণ্টন প্রসঙ্গই ধরা যাক। আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে কোনও একটি নদী দুই বা ততোধিক দেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হলে জলের অধিকার থাকে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির। তিস্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি করতে ব্যর্থ হয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ এবং বর্তমানেও চুক্তিটি কার্যকর করা যাচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তিতে।

অবশ্য এসবই সম্ভব হচ্ছে জনগণের অশিক্ষা, দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে। বিভিন্ন রাজ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষেও জনগণকে অবহিত করার কোনও চেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প বা গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে ২ টাকা কিলো দরে গম এবং ৩ টাকা কিলো দরে চাল দেওয়ার প্রকল্পের কথা। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি শতকরা ৯৩ শতাংশ মানুষ নাকি এই সুবিধা পাচ্ছেন— অথচ এই নিবন্ধকারের নিজের অভিজ্ঞতা অনেক অভাবী মানুষ এখনো ডিজিটাল রেশন কার্ড পাননি এবং পুরানো কার্ডে তাদের রেশন দেওয়া হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি কেজি গমে ২২ টাকা এবং প্রতি কেজি চালে ২৯.৬৪ টাকা ভরতুকি দিচ্ছে— যা রাজ্য সরকার চেপে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ২৫ এপ্রিল ২০১৭ কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান তাঁর দপ্তরের মাধ্যমে সার্কুলার জারি করে জানিয়েছেন, প্রতিটি রেশন শপে প্রতিটি জিনিসে কেন্দ্রের ভরতুকি নোটিশ বোর্ডে লিখে রাখতে হবে।

এই প্রতিবেদকের চোখে কাছাকাছি কোনও রেশন শপে এমন কোনও বিজ্ঞপ্তি পরিলক্ষিত হয়নি। প্রতিদিনই রাজ্য সরকার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার তোপ দাগছেন— নানা প্রকল্পে টাকা বন্ধের অভিযোগে। টাকা দেরিতে আসার কারণ, পূর্বের বরাদ্দের টাকা খরচে ব্যর্থ হয়েছে রাজ্য বা প্রশাসনিক অপদার্থতা।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা হোক। এ প্রতিযোগিতা হবে উন্নয়নের জন্য, সমৃদ্ধির জন্য, এগিয়ে যাওয়ার জন্য। অন্ধ কেন্দ্র বিরোধিতা পরিহার করে, পারস্পরিক সহযোগিতা ভারতের সমৃদ্ধি এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সহায়ক হবে। মনে রাখা দরকার, ভারতীয় সংবিধান পৃথিবীর সর্ববৃহৎ লিখিত সংবিধান। সুতরাং পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সাংবিধানিক উপায়ে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব— ভারতরাষ্ট্রকে দুর্বল করে নয়। ■

মুখ খুললেই দিদি ভারতী করে দেবেন

মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

দিদি,

রাজনীতিক নন ভারতী। কিন্তু আপনি তাঁকে রাজনীতিক বানিয়েছিলেন। পুলিশের দায়িত্বে থাকার সময়ে তিনি ছিলেন রাজনীতিকের থেকেও বড় রাজনীতিক। তৃণমূলনেত্রীকে 'মা' ডাকা, 'দেবী' সম্বোধন করা ভারতীর কথায় পশ্চিম মেদিনীপুরে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। কিন্তু যেই ভারতী পদত্যাগ করলেন অমনি তিনিই এখন 'নির্যাতিতা'।

একের পর এক অডিও বার্তায় রাজনীতিকের কায়দায়, 'হে মোর বঙ্গবাসী, দেশবাসী' বলে জানাচ্ছেন কীভাবে রাষ্ট্রশক্তি তাঁকে হেনস্থা করছে। একেবারে শেষে 'জয়হিন্দ' ধ্বনি উচ্চারণের আগে নিয়ম করে রাজ্য সরকার ও পুলিশ-প্রশাসনকে হুমকি দিতেও ছাড়ছেন না।

তাঁর লকার থেকে কোটি কোটি টাকার গয়না উদ্ধার হয়েছে। তিনি বলেছেন সে গয়না জমিদার বাড়ির মেয়ে হিসেবে পেয়েছেন। সিআইডি-র প্রশ্ন, সেকালের গয়নায় একালের হলমার্ক কেন? চুপ ভারতী।

ভারতীর ঘনিষ্ঠ পুলিশ অফিসার থেকে শুরু করে স্বামী এমএভি রাজুর পরিচিতের বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকার নোট উদ্ধার। সে সবই নাকি সিআইডি-র সাজানো নাটক বলে অডিও-দাবি ভারতীর।

সব মিলিয়ে ভারতী-রঙ্গ জমজমাট বঙ্গে। অভিনেত্রী শ্রীদেবীর অকাল প্রয়াণ ভারতীকে আলোচনা থেকে সাময়িক সরিয়ে দিলেও একেবারে মুছে দিতে পারেনি। জনমানসে ভারতীকে নিয়ে, সরকারকে নিয়ে তৈরি হয়েছে অনেক প্রশ্ন।

ভারতী এমন কোণঠাসা হওয়ায় বড় অংশের মানুষ খুশি। গণ-আলোচনায় কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে সেই সব বাণী— ''যে যত তেল মারে, তার তত...যায়।'' কেউ আবার বলছেন, ''ওই 'মা' ডাক শুনেই বোঝা যেত ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।''

এসব তো ভারতীর নিন্দা। সরকারের নিন্দাও কম হচ্ছে না। আম আদমির আম দরবারে যে সব প্রশ্ন উঠছে তার মধ্যে পাঁচটি মারাত্মক।

১। তৃণমূলনেত্রীর 'আদরের কন্যা হিসেবে পরিচিত ভারতী ঘোষ এতদিন ধরে' এত কোটি কামিয়েছেন আর শাসক দল কিছুই জানত না আপনিও জানতেন না দিদি? নাকি সব চোখ বুজে দেখেছেন আর ভেবে রেখেছেন তাল বুঝে হাল খারাপ করব!

২। গয়না কেলেঙ্কারি থেকে গোরু বিক্রেতার অভিযোগ হঠাৎ সামনে এল কেন? এতদিন শাসক ঘনিষ্ঠ ভারতীর বিরুদ্ধে মুখ খোলা যেত না বলে?

৩। ভারতী যখন অফিসার ছিলেন তখন তাঁকে সম্পদ মনে করত রাজ্য প্রশাসন। রাতারাতি সেই ভারতীর এত দোষ! তখন বিরোধীরা যা বলত এখন তো সেটাই বলছে শাসক?

৪। এর আগে চিটফান্ড কাণ্ডে রাজ্যের প্রাক্তন পুলিশ কর্তার নাম জড়িয়েছে। এবার ভারতীর নানা কাণ্ড। তবে কি এই রাজ্যে পুলিশ কর্তাদের গোপন ভাণ্ডারে লুকিয়ে রয়েছে এমন অনেক অনেক কালো সম্পদ?

৫। অনেকেই বলছেন, ভারতীর বিরুদ্ধে সিআইডি তদন্ত জোরালো করে অন্য পুলিশ কর্তাদের বার্তা দিয়ে দিল নবান্ন। এর পরে কেউ ফোঁস করতে সাহস পাবে না। তাহলে কি সব কর্তাদেরই 'যখের ধন'-এর হদিশ জানে সরকার?

ভারতী ঘোষকে নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক প্রশ্ন। রাষ্ট্রশক্তি তাঁকে সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করছে বলে অডিও-কান্নাতেও সাধারণের মন ভেজাতে পারেননি। আজ যে পুলিশের বিরুদ্ধে সাজানো মামলার অভিযোগ করছেন তিনি, ভারতীর বিরুদ্ধেই এমন অনেক অনেক অভিযোগ উঠেছে। তাই ভারতীর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে জনমানসে অনেক আপত্তি। পাশাপাশি রাজ্য প্রশাসন ও সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতাও প্রশ্নের মুখে।

—সুন্দর মৌলিক

ডাঃ হেডগেওয়ারের হিন্দু রাষ্ট্রভাবনা চিরকালীন

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

রাষ্ট্রের প্রকৃত সংজ্ঞা কী? এরকম প্রশ্ন শুনলে অনেকেই বলবেন, মানচিত্রে নির্দিষ্ট সীমারেখার ভিতর একখণ্ড জমি, একটি স্বাধীন-স্বতন্ত্র সরকার, তার নিজস্ব আইন কানুন, নির্বাচন পদ্ধতি, সেই ভূখণ্ডে বসবাসকারী নাগরিকবৃন্দ--- এইসব মিলিয়েই একটি রাষ্ট্র। কিন্তু একথার ভিতর রাষ্ট্রের প্রকৃত সংজ্ঞাটি নিরূপণ করা হলো না। রাষ্ট্র নিছক একটি নির্দিষ্ট সীমারেখায় আবদ্ধ একখণ্ড ভূমিমাত্র নয়। একটি সরকার, তার বিচার ব্যবস্থা, তার প্রশাসন এবং তার জনসমূহও কেবলমাত্র রাষ্ট্র নয়। রাষ্ট্র চিন্তাটি আরও ব্যাপক এবং আরও গভীর। এই গভীর এবং ব্যাপক রাষ্ট্র চিন্তাটিই আলোড়িত করেছিল ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারকে। এবং এই ভাবনাই তাঁকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ডাঃ হেডগেওয়ারই প্রথম স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন যে, রাষ্ট্র কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডমাত্র নয়। বরং রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটি ভূখণ্ড যা একই সংস্কৃতির অনুসারী, একই পরম্পরায় বিশ্বাসী, একই সূত্রে বাঁধা এক জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি। কারণ, একই সংস্কৃতির অনুসারী, একই পরম্পরায় বিশ্বাসী, একই সূত্র বাঁধা জনগোষ্ঠী না হলে তাঁর রাষ্ট্রীয় ভাবনাটি সুদৃঢ় হয় না। আর রাষ্ট্রীয় ভাবনাটি সুদৃঢ় না হলে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রেরও উদয় হয় না। ডাঃ হেডগেওয়ারের এই রাষ্ট্রচিন্তারই আরও সহজ সরল একটি প্রতিফলন পাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকরের একটি কথায়। ষাটের দশকে এক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন— 'ভারত কি শুধুমাত্র হিন্দুদের জন্য নাকি?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন— 'না, হিন্দুদের জন্য শুধুমাত্র ভারতই।' বিশ্বের যে কোনও রাষ্ট্রের দিকে যদি তাকাই, দেখব, এই ধারণার ভিত্তিতেই পৃথিবীর সব রাষ্ট্রই তার পরিচয় পেয়েছে। যেমন ব্রিটেন ব্রিটিশদের জন্য, ফ্রান্স ফরাসিদের জন্য, জার্মানি জার্মানদের জন্য ইত্যাদি। এমনকী, মনে রাখতে হবে ১৯৪৭ সালে অখণ্ড ভারত ভেঙে পাকিস্তান আদায় করার পিছনেও মূল দাবি ছিল মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি। ডাঃ হেডগেওয়ার তাঁর রাষ্ট্রভাবনাটি পরিষ্কার করতে গিয়ে বলেছিলেন— 'মন থেকে সব দুর্বলতা দূরে সরিয়ে রাখুন। আমরা কখনই বলছি না যে অন্যরা এখানে বসবাস করতে পারবেন না। কিন্তু বসবাস করার সময় তাদের এটা মনে রাখতে হবে তাঁরা হিন্দুদের আবাসভূমি হিন্দুস্থানে বসবাস করছেন। এখানে হিন্দুদের অধিকারকে তাঁরা খর্ব করতে পারবেন না।' ব্রিটেন, জার্মানি বা ফ্রান্সে বসবাস করার সময় যেমন আমরা এটি স্বীকার করেই নিই ব্রিটেন ব্রিটিশদের, ফ্রান্স ফরাসিদের এবং জার্মানি জার্মানদের এবং ওসব দেশে তাদের অধিকার খর্ব করা যাবে না— তেমনই ভারতে হিন্দুদের প্রাধান্য এবং স্বীকৃতিকে স্বীকার করতেই হবে— একথাই ডাক্তারজী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রাক্‌লগ্নেই বলেছেন।

গত শতকের বিশের দশকের শুরুতে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালেই ডাঃ হেডগেওয়ার এই হিন্দু রাষ্ট্রভাবনার গুরুত্বটি উপলব্ধি করতে থাকেন। নারায়ণ হরি পালেকর ডাঃ হেডগেওয়ারের জীবনীতে লিখেছেন, 'ডাক্তারজী যখন জেল থেকে বেরিয়ে এলেন তখন মুসলমানদের মুখে বন্দে মাতরম্-এর স্থানে আল্লা হো আকবর ধ্বনি গুঞ্জিত হচ্ছিল এবং সভাসমিতিগুলিতে মোল্লা মৌলবিরা কাফেরদের হত্যা তথা জেহাদ-এর অনুজ্ঞা প্রদানকারী কোরান শরিফের আয়াত পাঠ করে শোনাতেন। আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মতো ব্যক্তিরা যে খিলাফতের নেতা ছিলেন, তার থেকে আর কী আশা করা যেতে পারে? কারণ হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার কাজেই কৌশল দেখাবার জন্য ফিরিঙ্গি মহল থেকে তাদের মৌলানা সনদ লাভ হয়েছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও এই মনোভাব প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিল যে, মুসলমানরা অন্য সকলের থেকে আলাদা এবং কিছুটা বিশেষ ধরনের মানুষ।' বিশের দশকের গোড়া থেকেই মুসলমানদের এই আক্রমণাত্মক মনোভাব বেড়ে যাচ্ছিল এবং তখন থেকেই স্বতন্ত্র মুসলিম আবাসভূমির দাবিও জোরদার হয়ে উঠেছিল। এমনকী বিশের দশকের গোড়াতেই খিলাফত আন্দোলনের নেতারা ভারত থেকে ইংরেজ বিতাড়ন করে আফগানিস্তানের আমিরকে এখানে শাসন ক্ষমতায় বসাবার বাসনা করেছিলেন। এবং তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয়, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। গান্ধীর এই ভূমিকার সমালোচনা করে বাবাসাহেব আম্বেদকর বলেছিলেন--- 'কোনও প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি কি হিন্দু-মুসলমান একতার জন্য এত দূর পর্যন্ত যেতে পারে? (Can any sane man go so far, for the sake of Hindu Muslim unity ?)

ভারত রাষ্ট্রটির প্রতি সেই সময় থেকেই মুসলমান নেতাদের কোনও একাত্মবোধই ছিল না— তার একটি নিদর্শনও পাওয়া যায় নারায়ণ হরি পালেকরের লেখায়। পালেকর লিখেছেন— ' ডাক্তারজী একটি পরিষদের বৈঠকে যোগদান করতে

যাচ্ছিলেন। সেই সময় সমিউল্লা খাঁ-ও তাঁর সঙ্গে যাচ্ছিলেন। ডাক্তারজী সেই সময় সাদা খদ্দরের টুপি এবং মাঝে মাঝে খদ্দরের চাদরও ব্যবহার করতেন। খাঁ সাহেবের মাথায় তুর্কি টুপি দেখে ডাক্তারজী জিজ্ঞেস করলেন, 'অসহযোগ আন্দোলনের সময় সাদা টুপি এত প্রচলন হবার পরও আপনি তা পরতে শুরু করেননি?' তৎক্ষণাৎ খাঁ সাহেব স্পষ্ট কথায় উত্তর দিলেন, 'আমি প্রথমে মুসলমান এবং এই টুপি তারই প্রতীক। তাই এই টুপি ত্যাগ করার প্রশ্নই ওঠে না।' ওই সময়ই মালাবারে মোপালা মুসলমানদের দ্বারা দেড় হাজার হিন্দুকে হত্যা এবং কুড়ি হাজার হিন্দুকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার ঘটনাও ডাক্তারজীকে বিচলিত করে তোলে।

ডাক্তারজী বুঝতে পারছিলেন, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য একটি বুদবুদের মতো। এই হিন্দু-মুসলমান ঐক্য কখনই সম্ভব নয়। এ-ও বুঝেছিলেন, ভারত রাষ্ট্রের কাঠামোটিকে সুদৃঢ় করতে প্রয়োজন তার হিন্দু রাষ্ট্রীয় চরিত্র। কারণ এই হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু পরম্পরায় লালিত ভারতে হিন্দু রাষ্ট্রীয় ভাবনাই এক সূত্রে গাঁথতে পারে সমগ্র দেশকে। মুসলমানরা তাদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি গড়তে চায়। অতএব ভারতের অস্তিত্ব রক্ষা করতে গেলে 'হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান' নিঃসঙ্কোচে একথা বলতেই হবে। শুধু ডাক্তারজী নন, এই সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা লাজপত রাইয়ের মতো নেতারাও মনে করছিলেন, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভাবনা অবাস্তব। দেশবন্ধু লাজপত রাইকে একটি চিঠিতে লিখেওছিলেন, 'আমার মনে হয় হিন্দু-মুসলমান একতা সম্ভব নয় এবং ব্যবহারিকও নয়।' এমনকী সাতনায় মহারাষ্ট্র প্রান্তীয় পরিষদে ব্যারিস্টার রাজারাও দেশমুখ বলেছিলেন— 'ভারতীয় রাষ্ট্রীয়তাকে যদি পুনরায় বাঁচিয়ে তুলতে হয় তাহলে হিন্দুদের মুসলমানদের মতো সমান সঙ্ঘবদ্ধ তথা শক্তিশালী হতে হবে।'

এই শক্তিশালী হিন্দু রাষ্ট্র ভাবনা থেকেই ১৯২৫-এ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। হিন্দু সমাজের মঙ্গলের ওপরই যে ভারত রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি এবং মঙ্গল রক্ষা করছে— সেই ভাবনাই সঙ্ঘের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন সর্বত্র। বলেছিলেন, 'হিন্দুর আনন্দই আমার এবং আমার পরিবারের আনন্দ। হিন্দু সমাজ যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে, প্রতিনিয়ত যেভাবে অপমানিত হচ্ছে, সে সমস্যা আমারও সমস্যা। সে অপমান আমারও অপমান। প্রত্যেক হিন্দুর ভিতরে এই বোধ আসা উচিত। হিন্দু ধর্মের এটিই মূল কথা।'

সংকীর্ণ হিন্দু ভাবনা নয়, হিন্দুত্বকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করার জন্যই যে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা তা বোঝাতে তিনি গেরুয়া ধ্বজকেই সঙ্ঘের ধ্বজ হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন। কোনও বিশেষ হিন্দু দেবদেবীকে কখনই তিনি সঙ্ঘের আরাধ্য দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠা করেননি। বলেছিলেন, 'কোনও ব্যক্তি বিশেষ নয়, গৈরিক ধ্বজকেই সঙ্ঘ তার গুরু মানে। গৈরিক ধ্বজ সঙ্ঘের সৃষ্টি নয়। সঙ্ঘের আলাদা ধ্বজ তৈরি করার কোনও বাসনাও নেই। এই গৈরিক ধ্বজ হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের এই রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক। এর একটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। এই গৈরিক ধ্বজ হিন্দু সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।' হিন্দুর প্রধান দুর্বলতা— সে তার নিজের অতীত গৌরব সম্বন্ধে সচেতন নয়। সে বিস্মৃত হয়েছে এক সময় এই হিন্দু সমাজ কতখানি শক্তিশালী ছিল। শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ হিন্দু সমাজই যে ভারত রাষ্ট্রটিকে রক্ষা করতে পারবে— সে বিশ্বাস ডাক্তারজীর ছিল।

এই হিন্দু রাষ্ট্র ভাবনার ভিতর দিয়ে দূরদৃষ্টির পরিচয়ও দিয়েছেন ডাক্তারজী। বিশের দশকে যখন কংগ্রেস নেতৃত্ব মুসলমান তোষণের রাজনীতিতে ব্যস্ত, তখনই ডাক্তারজী বুঝেছিলেন— তোষণের রাজনীতির এই বিপজ্জনক প্রবণতা ভারত রাষ্ট্রটিকে ভবিষ্যতে গভীর অস্তিত্বের সংকটের ভিতর ফেলবে। ১৯৪০-এ ডাক্তারজী প্রয়াত হওয়ার মাত্র সাত বৎসরের মাথায় এই ভারত রাষ্ট্রটি দ্বিখণ্ডিত হলো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে গত সত্তর বৎসরে 'ইন্ডিয়ান' হওয়ার তাগিদে ভারত রাষ্ট্রটির কাঠামোর উপর বারবার আঘাত করা হয়েছে। তার সংস্কৃতি, তার পরম্পরা, তার ধর্ম এবং সমাজভাবনা— আঘাত করা হয়েছে সবকিছুর ওপরই। এতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বরং ভারতের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রবিরোধী নতুন নতুন শক্তি জন্ম নিয়েছে, শক্তিশালী হয়েছে। ভিতর থেকে ভারতের রাষ্ট্র কাঠামোটিকে দুর্বল করার অবিরাম চেষ্টা তারা চালিয়ে যাচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আজও ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের ভাবনা প্রাসঙ্গিক। শেষ করব ডাক্তারজী সম্পর্কে দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকরের একটি মন্তব্যে। গোলওয়ালকর বলেছিলেন, 'আমাদের আরাধ্য হিন্দু রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ সাক্ষাৎকার হয়েছিল বলেই সম্পূর্ণ সঙ্কট, সকল বাধা তাঁর নিকট সহজ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল এবং তাঁর উপাস্যের প্রতি ভক্তির প্রখর আগুনে তিনি ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনের আকর্ষণ এবং সর্বপ্রকার স্বার্থকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবার অলৌকিক আনন্দ অনুভব করেছিলেন।'

ডাঃ হেডগেওয়ারের সার্থকতা এখানেই, তিনি ম্রিয়মান, হীনম্মন্য হিন্দুর হৃদয়ে সাহস, মর্যাদাবোধ এবং শক্তির সঞ্চার করতে চিরকালীন চিরপ্রণম্য অনুপ্রেরণার কাজ করে চলেছেন।

■

সঙ্ঘের দৃশ্যমান রূপ ডাক্তারজীর ভাবনার ফসল

বিদ্রোহী কুমার সরকার

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজী সঙ্ঘের মাধ্যমে তিনটি বিষয় জনসমক্ষে তুলে ধরতে চেয়েছেন। (১) শক্তির অধিষ্ঠান, (২) রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যবোধ, (৩) অনুশাসন ও একসূত্রতার জাগরণ। রাষ্ট্রীয়ত্বের মনোভাব না থাকায় কেমন করে আমাদের সমাজকে পরাভূত হতে হয়েছে তার বর্ণনা তিনি বারবার করেছেন এবং বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যখন নিজেকে 'হিন্দুরাষ্ট্রাঙ্গভূতা' অর্থাৎ হিন্দু রাষ্ট্রের একজন বলে উপলব্ধি করতে পারবে তখনই আমরা এই অধঃপতন থেকে পুনরায় অভ্যুত্থান করতে পারব আর এই উপলব্ধি যার আসবে সেই হলো প্রকৃত স্বয়ংসেবক। শাশ্বত কথা। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতেও এর নড়চড় হওয়া কাম্য নয়। প্রকৃত স্বয়ংসেবক হওয়ার লক্ষ্যেই আমাদের কার্যপদ্ধতি ও কার্যক্রম।

ডাক্তারজীর কল্পনায় ছিল সঙ্ঘ অর্থাৎ সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজ। Conceptionally Sangha and Society are co-existed, কিন্তু মানসিকতার দিক থেকে সঙ্ঘ সম্পূর্ণ হিন্দুসমাজের সঙ্গে একাত্ম। Psychologically RSS is identified with the entire Hindu Society— হিন্দু সমাজের একটি অংশ মাত্র নয়। হিন্দু সমাজের অন্তর্গত কোনও একটি সংগঠনও নয়, কোনও সম্প্রদায় নয়, কোনও দল নয়, কোনও মত নয়। সম্পূর্ণ হিন্দুসমাজই হলো সঙ্ঘ। Nation in a miniature, সঙ্ঘ রাষ্ট্রের এক ছোট প্রতিকৃতি। বর্তমানে সঙ্ঘের কার্যবৃদ্ধির জন্য সমাজের লোকের মনে এমনকী স্বয়ংসেবকদের মনেও নানারকম চিন্তা আসতে দেখা যাচ্ছে। সমাজের লোকেরা ভাবছে সঙ্ঘ একটা রেজিমেনটেড ফোর্স, সব সমস্যার সমাধান তার কাছে আছে অর্থাৎ তারা সঙ্ঘকে দল হিসাবে সমাজ থেকে পৃথক কিছু ভাবতে শুরু করেছে। তারা অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে সঙ্ঘকে গুলিয়ে ফেলছে। তাদের কাছে তো অন্ধের হাতি দর্শনের অবস্থা। স্বয়ংসেবকেরাও বিভিন্ন ভ্রমের শিকার হচ্ছে। সঙ্ঘ পনেরো বছরে (১৯২৫-৪০) সমাজে স্থান করে নেওয়ার মতো সংগঠন নির্মাণে সফলতা লাভ করেছিল, তার মর্ম বিশ্লেষণ করে ডাক্তারজী ১৯৪০ সালে বলেন, 'আমরা যে সাফল্য লাভ করেছি তা স্বয়ংসেবকদের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের শক্তিতেই হয়েছে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই কাজ হতে পারত না। কোনো তত্ত্বজ্ঞানকে যদি প্রমাণ করতে হয় এবং সত্যতা জনসাধারণকে শেখাতে হয়, তাহলে তার জন্য শক্তির অধিষ্ঠান আবশ্যক।' তিনি বারবার বলেছেন— 'মনে রাখবেন, যদি শক্তি না থাকে তাহলে ন্যায়বিচারও মূল্যহীন হয়ে পড়ে (Justice without force is impotent)।' দীর্ঘ ৯০ বৎসর ধরে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের এই নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের জন্য সারা বিশ্ব আজকে সঙ্ঘকে শক্তির অধিষ্ঠান হিসাবে লক্ষ্য করছে। সঙ্ঘের কোনো কথাকেই তারা গুরুত্ব না দিয়ে পারছে না। সংবাদমাধ্যমে সঙ্ঘের পক্ষে-বিপক্ষে বাদানুবাদ শুরু হয়ে যাচ্ছে। আমরা স্বয়ংসেবকরাও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছি। আমরা কেউ কেউ হতাশ হয়ে পড়ছি। ভাবছি বা বলছি এটা না হলেই ভালো হোত, আরও কত সুচিন্তিত মতামত দিয়ে ফেলছি। ভাবছি না সঙ্ঘের যে বক্তব্য সেটা সুচিন্তিত বক্তব্য। তার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। তার স্বপক্ষে যুক্তি তৈরি করতে হবে। তার জন্য রীতিমতো পড়াশুনা করা দরকার। ডাক্তারজীর পূর্ণচিন্তন এমনি আসেনি। কাজেই শুধু টিভি বা খবরের কাগজে মাথা গুঁজে না থেকে রাষ্ট্রের কল্যাণকারী বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা আজ খুব প্রয়োজন। ডাক্তারজীর সেই কথা মেনে চলা উচিত— 'হাতি চলে বাজার, কুত্তা ভুকে হাজার।'

সঙ্ঘ শুরু ১৯২৫ সালে। প্রথমে তো সবাই হাসাহাসি, উপেক্ষা করেছে। বছর দশেক পর থেকে বিরোধিতা শুরু হয়েছে। ১৯৩৭ সাল থেকে সেই বিরোধিতা বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। ১৯৩৭ সালে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের সমাজবাদী বলে দাবি করে একদল ছাত্র সঙ্ঘের বিরুদ্ধে বিরাট অপপ্রচার শুরু করে দেয়। তারা সঙ্ঘের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা, হিটলারের নাৎসী বাহিনীর মতো একনায়কতন্ত্রী হবার অভিযোগ করে। সেই সময় ডাক্তারজী কাশীতে ছিলেন। তাঁর হাতেও সেই অপপ্রচারের চিঠি আসে। ডাক্তারজী স্বয়ংসেবকদের বললেন, কোনও উত্তর দেওয়ার দরকার নেই। এই অপপ্রচারকে উপেক্ষা করে নিজের কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করতে থাকো। সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছু পরে বিরোধীরাই হতাশ হয়ে পড়ল।

আজকের যুগে এই বাদানুবাদ একটা বড় সমস্যা। এর হাত থেকে সঙ্ঘকে বাঁচানোর জন্য ডাক্তারজীর প্রদর্শিত পথই উপযুক্ত পথ। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যবোধ বেশি প্রয়োজন ওই বাদানুবাদের থেকে। অনুশাসন ও একসূত্রতার জাগরণ ঘটালে তবেই নিজেদের সঙ্কল্পবদ্ধ রাখা যাবে। এটাই সঙ্ঘের পথ। তাঁর আচরণ ছিল চির-অনুসরণ যোগ্য। তিনি সতর্কতার সঙ্গে জীবনে আচরণ করতেন। 'অপরকে দিই ব্রহ্মজ্ঞান, নিজে থাকি নিরেট পাষাণ'— এই দুর্ভাগ্য তাঁর জীবনে আসেনি। 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়'--- এই নীতিবাক্য ডাক্তারজীর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হতে দেখা গিয়েছে। আজকে সবচেয়ে অভাব এই আচরণের। কাজেই ডাক্তারজীর চিন্তাভাবনা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতেও সমানভাবে প্রযোজ্য ও পালনীয়।

(লেখক উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক)

মতবাদের দৈন্যতার কারণেই বামপন্থীরা আজ বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি

গৌতম মুখোপাধ্যায়

লেখাটি ইতিহাসভিত্তিক হলেও অনেকেরই মনে হতে পারে, এটি অনৈতিহাসিকতা দোষে দুষ্ট। আমি এতে কারো দোষ দেখি না; কেননা যুক্তি-প্রমাণ আমাদের হাতে না থাকলে, মনঃপুত নয় এমন বিষয়কে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে আমরা অনেকেই আত্মশ্লাঘা বোধ করি। ইতিহাসের গবেষক নন বা নন বিদগ্ধ ঐতিহাসিক, তাঁরাও, এই রচনাটি পাঠ করে ইতিহাস-মনস্কতার দ্বারা পরিচালিত হবেন--- এই বিশ্বাসে সহজলভ্য খাতা-কলম নিয়ে একটু না হয় ইতিহাসের কিছু কানাগলিতে উঁকি-ঝুঁকি দিলাম!

একদল মেধাসম্পন্ন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক গোষ্ঠী (এঁরা ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর ভাষায় 'একদেশদর্শী') আবিষ্কার করলেন, বৈদিক যুগে হিন্দুরা গোমাংস ভক্ষণ করতেন। এঁরা বিশ্বব্যাপী খ্যাতিও অর্জন করলেন, দেশে-বিদেশে বক্তৃতা দিলেন, গুরুগম্ভীর গ্রন্থ রচনা করলেন, আবার দলতন্ত্রের অঙ্গীভূতও হলেন। এঁরা কিছু সাহিত্যিকের বর্ণনা থেকে আলোকপ্রাপ্ত হয়ে উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন এবং তা জোরের সঙ্গে প্রচার করলেন। এদিকে এতদিনে তাঁদের নাম-ডাক এতই হয়েছে, সাহেবদের এতই বাহবা কুড়িয়েছেন, অন্যরা চুপসে গেলেন। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যে তাঁদের মতবাদ আদৃতও হলো।

কিন্তু এখানে থেমে গেলেই তো হবে না। ইতিহাস বলে 'চরৈবেতি', 'চরৈবেতি'; 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'। ডিঙাকে নোঙর বেঁধে বসে থাকলে তো চলবে না! মুক্ত চিন্তার যুগে

একেবারে মর্মে পৌঁছতে হবে; কাজ সহজ নয়, সাহসী পদক্ষেপটাও জরুরি। প্রসঙ্গে ফিরি। বৈদিক যুগে (আদি ও পরবর্তী) গোরু ছিল বিনিয়ের মাধ্যম, গোধন দিয়েই সম্পত্তির মূল্য নিরুপিত হতো। পৃথিবীর কোন কালে কোন জাতি তার বিনিময়ের মাধ্যম (আজকের পরিভাষায় টাকা, পাউণ্ড, স্টার্লিং ইত্যাদি)-কে উদরসাৎ করেছে? যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয়, বিলাসী উচ্চবর্গের মুষ্টিমেয় জনের দ্বারা তা সম্ভবপর হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা তো ছিল নেহাতই হাতে গোনা--- পরিসংখ্যানের বাইরে। সম্পূর্ণ কৃষিপ্রধান, পরিবেশবান্ধব সমাজে গোরু ছিল সৃজনশীলতার প্রতীক। এই ধন নিধন করার ধৃষ্টতা দেখানো কি তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আদৌ সম্ভব ছিল? ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, কৃষি, এমনকী বিনোদনেও গোরু ছিল একটি 'প্রাইম ফ্যাক্টর'। এ তো নিজের হস্ত কর্তন করে মাংসের আস্বাদান নেওয়ার শামিল!

এছাড়া, বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখ আছে, গোরুর মধ্যে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী সন্নিবিষ্ট আছে। ধর্মই যখন রাষ্ট্রশক্তির চালিকাশক্তি ছিল, সেই যুগে গোরুকে আহার করা তো দেব-দেবীকে অবমাননা করা, পাপাচারে লিপ্ত হওয়া। আজও বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ 'হিন্দু ওয়ে অব্ লাইফ'-এ বিশ্বাসী। ঐতিহ্য ফল্গুধারার মতো সবেগে প্রবহমান। তাহলে এই সত্য আজ উন্মোচিত হওয়া বড়ই প্রয়োজন। সমগ্র হিন্দুসমাজ একযোগে গোমাংস ভক্ষণ কবে থেকে পরিত্যাগ করলো বা আদৌ ভক্ষণ করতো কি? অনেকে প্রতিবাদী ধর্মে (বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক)-র উল্লেখ সাপেক্ষে পশুর উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের অপযুক্তি পেশ করতেই পারেন, তবে তা খণ্ডিত সত্য, সমগ্রতা নির্ভর নয়। কেননা, প্রতিবাদী ধর্ম হিন্দু সমাজের কাছে কবেই 'হার মানা হার' গলায় পড়েছে।

অতি সম্প্রতি ইমানুল হক 'সূক্ষ্ম-সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতা'-এই শিরোনামে একটি গ্রন্থ

রচনা করেছেন, যা দেশ প্রকাশন, ৬, ডালিমতলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৬ থেকে প্রকাশিত। যদি গ্রন্থের ঠিকানা 'বটতলা' হতো তাহলে তা সার্থকনামা হতো। প্রকৃতপক্ষে এটি আমার কাছে একটি 'বটতলা'-র গ্রন্থ। এই গ্রন্থের ৬০ পৃষ্ঠায় 'রাম এবং গোমাংস— মোদী আমোদী রামভক্তরা এট্টু যদি রামায়ণ পড়তেন' শীর্ষক শিরোনামে যা ছাপা হয়েছে তা ক্ষমাহীন ইতিহাস বিকৃতি। সেখানে লেখা হয়েছে ''চিত্রকূট যাওয়ার আগে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম স্থলে ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে পৌঁছলেন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা। ভরদ্বাজমুনি কী আহার করতে দিয়েছিলেন তাঁর আশ্রমে? 'উপনয়ত ধর্মাত্মা গামর্ঘ্যমুদকং ততঃ' (অযোধ্যাকাণ্ডম্, চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গ, শ্লোক ৮৯)। তিনজনের জন্য গো (মাংস), উদক এবং অর্ঘ্য দিলেন। সঙ্গে ফলমূল। মূল 'রামায়ণ' থেকে এই উদ্ধৃতি।"

পাঠকদের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করি, অযোধ্যাকাণ্ডম্, চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গ, শ্লোক ১৬ এবং শ্লোক ১৭ তে যা আছে তা অবিকৃতভাবে তুলে ধরতে চাই—

শ্লোক ১৬ :

''পিত্রা নিযুক্তা ভগবন্ প্রবেষ্যামঃ তপোবনম্।

ধর্মম্ এব আচরিষ্যামঃ তত্র মূলফলাশনাঃ।।"

অনুবাদ : ''ভগবান (ভরদ্বাজ) আমরা বাবার দ্বারা প্রেরিত হয়ে এই তপোবনে এসেছি ধর্মাচরণ করার জন্য। ফলমূল আমাদের খাদ্য"

রঘুবংশের ইতিহাস থেকে জানা যায়, নন্দিনীর সেবা করে রঘু পুত্র লাভ করেছিলেন। তার ফলেই দশরথ, রামচন্দ্র প্রমুখ রাজন্যবর্গ জন্মলাভ করেছিলেন। এই নন্দিনী কে? নন্দিনী একটি গাভীর নাম। যে রাজবংশ গাভীর সেবা করা থেকে উৎপত্তিলাভ করেছিল, তারা গোমাংস ভক্ষণ করত; এই তথ্য শুধু মিথ্যাই নয়, তা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে।

শ্লোক ১৭ :

''তস্য তং বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।

উপনয়ত ধর্মাত্মা গাম্ অর্ঘ্যম উদকম ততঃ।।"

অনুবাদ : ''সেই বুদ্ধিমান রাজকুমারের কথা শুনে ধর্মাত্মা (ভরদ্বাজ) তাঁর জন্য গোরু/গাভী (গাম্) অর্ঘ্য ও জল (উদক) আনিয়ে দিলেন। 'গো' শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন গাম্। তা কেবল গাভী বা গোরু অর্থ প্রকাশ করতে পারে। গো-জাত অন্য কোনো অর্থ, যেমন— মূত্র, মাংস, দুধ ইত্যাদি প্রকাশ করতে পারে না।

সুতরাং পাঠকবর্গ সহজেই অনুমান করতে পারছেন, যে অতিথিরা 'ফলমূল আমাদের খাদ্য' জানাচ্ছেন, তাদের গো মাংস দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে, এই তথ্য সর্বৈবভাবে ইতিহাস বিকৃতির শামিল। এই ইতিহাস বিকৃতিতে বামপন্থী ঐতিহাসিকদের বিশেষ অবদান লক্ষ্য করা যায়। আমরা জানি, হিন্দুদের শ্রাদ্ধ ও উপনয়ন নামক দুই পবিত্র অনুষ্ঠানে গোরু বা গাভী যুক্ত। কীভাবে? শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ষোড়শোপচার দানে ব্রাহ্মণদের গাভী দান করা করা হয়, আবার উপনয়ন অনুষ্ঠানে দ্বিজপুত্র তিন দিন 'অসূর্যমপশ্যা' থাকার পর গাভীর মুখ দর্শন করে সূর্যের মুখ দর্শন করে। সুতরাং গোরু বা গাভী হিন্দুদের কাছে এক পবিত্র দেবসদৃশ প্রাণী রূপে সমাদৃত। পাশাপাশি এই প্রশ্ন উঠতে পারে, বৈদিক যুগে যদি আর্যরা গো-মাংস ভক্ষণ করতেন তাহলে কোনও সময় থেকে এই 'ফুড রেভেলিউশন' সংঘঠিত হয়েছিল? অর্থাৎ কোন সময় থেকে সমগ্র আর্যজাতি চুক্তিবদ্ধ হন যে, তারা গোমাংস ভক্ষণ পরিত্যাগ করবেন? এ বিষয়ে আশ্চর্যজনকভাবে বামপন্থীরা নীরব।

বামপন্থী দর্শনের মূল সমস্যা হলো, তারা ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যকে একপাশে সরিয়ে রেখে ভিনদেশীয় দর্শন ও দার্শনিকদের প্রতি এমনই মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে, যা তাদের রচনাতেও প্রতিফলিত হয়। আর এই দর্শনের অনুরাগী ঐতিহাসিকরাও দলতন্ত্রের বাইরে বের হতে পারেনি। ফলত ইতিহাস চর্চা হয়ে উঠেছে একদেশদর্শী। প্রকৃতপক্ষে, হিন্দু সমাজকে গোমাংস ভক্ষণ করিয়ে বামপন্থীরা চেষ্টা করছেন, তাদের মতবাদের অভিনবত্ব প্রতিষ্ঠায়। তাছাড়া, আর্যরা বাইরে থেকে এসেছে— এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠাও সহজতর হবে বলে তাঁরা মনে করেছিলেন। আর সেই কারণেই হিন্দুদের গোমাংস ভক্ষণের মিথ্যা প্রচারের ফানুস তাঁরা উড়িয়ে ছিলেন। মতবাদের এই দৈন্যতার কারণেই তাঁরা ক্রমশ বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিতে নাম লেখানোর লাইনে অপেক্ষমান। পরিশেষে, দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করি, সনাতন হিন্দু সমাজে গোরু ছিল পবিত্রতার আর এক নাম— ভক্তির বাহন, সম্পদের আবাহন। সেই কারণে এই সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে কিছু ঐতিহাসিক বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দিলেও শাশ্বত সনাতন ভারতবর্ষের কাছে তা লীন হয়ে গেছে।

স্বল্প পরিসরে কিছু যুক্তি উত্থাপিত করেছি, এ বিষয়ে বহুল বিতর্ক হলে ভবিষ্যতে আরও তথ্য-প্রমাণ সহকারে অগ্রসর হবার বাসনা রইল। এতে ইতিহাস সমৃদ্ধ হবে, চিরায়ত ভারতীয় সভ্যতা ঋদ্ধ হবে।

তথ্যসূত্র : অধ্যাপক রোমিলা থাপার, ডঃ ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য, ডঃ এস কে মাইতি, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখের নানান রচনা সম্ভার।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নতুন আঘাত

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ভাগাভাগি করে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার বিধান রেখে অর্পিত সম্পত্তি (শত্রু সম্পত্তি) প্রত্যর্পণ আইনের নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশের ভূমি মন্ত্রণালয়। এই বিধিমালা চূড়ান্ত করা হলে প্রকৃত অংশীদাররা বঞ্চিত হবেন। সমাজে দেখা দেবে বৈষম্য।

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল বারকাত এই প্রতিনিধিকে বলেন, অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন করার পর হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা হলেও আশার আলো জ্বলেছিল। কিন্তু নতুন বিধিমালা তাদের আরও বড়ো সংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দেবে। অর্পিত সম্পত্তি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আবুল বারকাত বলেন, আইনগতভাবে যারা দাবিদার, তারাই ওই জমি পাবেন। এ ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুবিধাভোগী গোষ্ঠী হিসেবে টেনে আনা অন্যায্য, অযৌক্তিক। জনবিরোধী এই বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগের প্রতিবাদে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন জাতীয় নাগরিক সমন্বয় সেলভুক্ত কয়েকটি সংগঠন এক সংবাদ সম্মেলন করে বলেছে, যারা ভূমিদস্যু তারা অন্যদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা তৈরি করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এক সময়ে হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করা শেষ হলে তারা পদোন্নতি পেয়ে অন্যদের সম্পত্তিতে হাত বাড়ায়। কারণ, লুটেরার হাত কখনও থামতে জানে না। শাস্তি না দেওয়া হলে তাদের থামানো সম্ভব নয়। সংবাদ সম্মেলনে তদারকি সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সুলতানা কামাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন, কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন 'অনেক কিছুই করা যায় না, কারণ পাকিস্তানি মনোভাবের লোকজন দেশে রয়ে গেছে। সংস্কৃতির অনেক কিছুই প্রতিষ্ঠা

করা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের অনুরোধ তিনি (প্রধানমন্ত্রী) যেন চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন কাদের মধ্যে পাকিস্তানি--- সাম্প্রদায়িক মনোভাব রয়ে গেছে।' তিনি বলেন, অর্পিত সম্পত্তি শুধু যে হিন্দু সংখ্যালঘুদের সমস্যা এমন নয়। হিন্দুরা যে অবস্থানে আছে সেখান থেকে তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তাই যারা অন্যদের সম্পত্তি লুট করে তাদের থামানো প্রয়োজন। কিছু মানুষ সমস্ত মানুষের সম্পদ অপহরণ করে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করছেন।

খসড়া বিধিমালার ৪ নম্বর ধারায় সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় ১৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় চাকরিরত দশ বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত সমবায় সমিতিকে বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য এই জমি স্থায়ীভাবে বরাদ্দ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, মহানগর এলাকায় সর্বোচ্চ ৬৬ শতাংশ এবং জেলা ও উপজেলা সদরে সর্বোচ্চ এক একর (একশো শতাংশ) অ-কৃষি জমি বাজারমূল্যে পরিশোধের শর্তে স্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে। মহানগর এলাকায় জনপ্রতি সর্বোচ্চ পাঁচ শতাংশ এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সর্বোচ্চ আট শতাংশ জমি দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, এই ধারাটি সন্নিবেশ করার ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর হাত থাকতে পারে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের যারা এই খসড়াটি তৈরি করেছেন, তাদের স্বেচ্ছাচারিতারও প্রতিফলন ঘটেছে। তাদের মতে, এই বিধিমালা বাস্তবায়ন করা হলে জমির উত্তরাধিকার-সহ অংশীদার ও নিরীহ হিন্দু জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করা হবে।

২০০১ সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন প্রণয়ন করা হয়। বংশপরম্পরায় প্রকৃত অংশীদারদের মাঝে জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু করতে গত ১৭ বছরেও আইনের বিধিমালা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি যে খসড়া বিধিমালাটি তৈরি করা হয়েছে, সেটিতে বঞ্চিত হিন্দু

জনগোষ্ঠীর স্বার্থবিরোধী নানা ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। খসড়া বিধিমালার ৪ নম্বর ধারার (খ) অনুচ্ছেদে বলা হয়, সংশ্লিষ্ট অংশীদার, দাবিদাররা বাজার মূল্যের দশ শতাংশ কমে মূল্য পরিশোধ করে কৃষি, অ-কৃষি জমির স্থায়ী ইজারা-বন্দোবস্ত নিতে পারবেন। অর্থাৎ মোট মূল্যের ৯০ শতাংশ পরিশোধ করতে হবে তাদের। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবুল বারকাত বলেন, ৫০-৫২ বছরের ভোগান্তির পর তাদের বিনামূল্যে জমি ফেরত দেওয়ার কথা। এখন অংশীদার, সহ- অংশীদারদের কাছ থেকে বাজার মূল্যের ৯০ শতাংশ আদায় করা হলে সেটা হবে অন্যায়।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত বলেন, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জমি দেওয়ার প্রস্তাবটি প্রচলিত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। আইনে বলা হয়েছে, হস্তান্তরকালে যেসব জমির কোনও দাবিদার থাকবে না, ওইসব জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লিজ গ্রহীতারা অগ্রাধিকার পাবেন। তিনি আরও বলেন, বাজারমূল্যের ১০ শতাংশ কমে ভুক্তভোগীদের জমি হস্তান্তর ধারাটি আইনের পরিপন্থী। ভূমি মন্ত্রণালয়ের কিছু স্বার্থান্বেষী কর্মকর্তা এই কাজটি করেছেন।

ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে, 'ক' ও 'খ' তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ ১১ লক্ষ ৫২ হাজার ৩২৩ একর। এর মধ্যে 'ক' তালিকায় ২ লক্ষ ২০ হাজার ১৯১ একর ও 'খ' তালিকায় জমির পরিমাণ ৯ লক্ষ ৩২ হাজার ১৩২ একর। মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন 'ক' তালিকাভুক্ত জমি-সংশ্লিষ্ট লিজ (একসনা বন্দোবস্ত) গ্রহীতাদের মাঝে স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত দিতে ওই বিধিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। ভূমি মন্ত্রণালয় আরও জানায়, 'ক' তালিকাভুক্ত মোট জমি ২ লক্ষ ২০ হাজার ১৯১ একর। এর মধ্যে ১ লক্ষ ৯ হাজার ৬৮১ একর জমি নিয়ে ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৩০০ মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জেলা পর্যায়ে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলাগুলো বিচারাধীন রয়েছে। ২০১২ সালে ট্রাইব্যুনাল গঠনের সময় থেকে গত সাত বছরে ১৫ হাজার ৭২৬ একর জমি নিয়ে ১৫ হাজার ২২৪টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭ হাজার ৫৩৯ একর জমির নিয়ে ৭ হাজার ৪৯১টি মামলা নিষ্পত্তি হয় সরকারের পক্ষে। অপরদিকে ৮ হাজার ১৮৭ একর জমি নিয়ে ৭ হাজার ৭৩৩টি মামলার ফল যায় সরকারের পক্ষে। এই হিসেবে ৯৩ হাজার ৯৫৫ একর জমির বিপরীতে ১ লক্ষ ৪ হাজার ৭৬টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন প্রণয়ন করা হয় ২০০১ সালে। এর পর সরকার পরিবর্তনের নানা চড়াই-উৎরাইয়ের পর 'ক' তালিকাভুক্ত জমির মালিকানা দাবি করে ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানানোর শেষ তারিখ ছিল ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর। বর্তমান সময়ে 'ক' তালিকার জমির আইনগত সমস্যা সমাধানের দাবিতে আবেদন করার সুযোগ নেই। ১৯৬৫ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুলস জারি করে ভারতে চলে যাওয়া হিন্দু জনগোষ্ঠীর জমিকে শত্রু সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করেছিল। পরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ওই জমিকে অর্পিত সম্পত্তি উল্লেখ করে ১৯৪৭ সালে নতুন আদেশ জারি করে। পরে ২০০১ সালে আওয়ামি লিগ সরকার উত্তরাধিকার ও সহ-অংশীদারদের মাঝে জমি ফেরত দিতে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন-২০০১ প্রণয়ন করে। একই বছরে জমির তালিকা তৈরি করে ৯০ দিনের মধ্যে প্রকাশের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল। পরে ২০০২ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসে সুবিধাজনক সময়ে তালিকা প্রকাশ করার কথা উল্লেখ করে আদেশ জারি করে। এর পর পাঁচ বছরেও তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। ২০০৭ সাল থেকে সেনা নিয়ন্ত্রিত তদারকি সরকারের দুই বছরে এ নিয়ে কোনও কাজ হয়নি।

২০০৯ সালে আওয়ামি লিগ পুনরায় ক্ষমতায় এসে ২০১১ সালে আইন সংশোধন করে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া শুরু করে। পরের বছর ২০১২ সালে প্রকাশ করা হয় তিন পার্বত্য জেলা বাদে সারাদেশের অর্পিত সম্পত্তির 'ক' ও 'খ' তালিকা। এরপর ২০১৩ সালে ব্যাপক আন্দোলনের মুখে আবার আইন সংশোধন করে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে 'খ' তালিকা বাতিল করা হয়। একই সঙ্গে 'ক' তফসিলের জমি প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের মাঝে হস্তান্তর করতে জেলা পর্যায়ে গঠন করা হয় পৃথক ট্রাইব্যুনাল। তখন সংশ্লিষ্টদের তিনশো দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে বলা হয়েছিল। আইন অনুযায়ী ওই তিনশো দিনের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করারও কথা ছিল। অথচ ওই সময়ে পেশ করা আবেদনগুলো নিষ্পত্তি করা হয়নি। ■

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপি ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

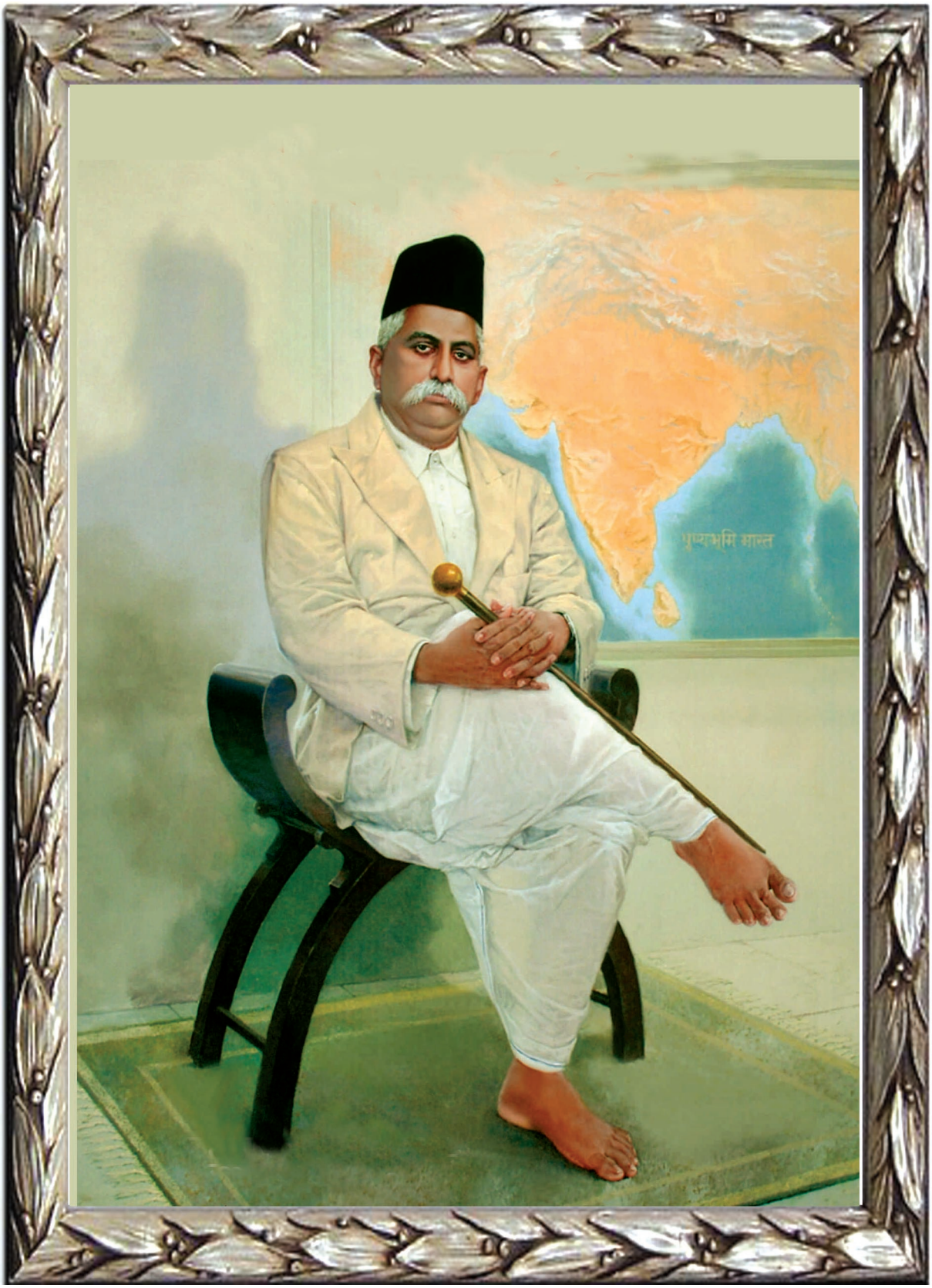

ডা: কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার

‘আমি অত্যন্ত খুশি যে, সারা দেশে এ দৃশ্য কোথাও দেখিনি’ ঃ গান্ধীজী

১৯৩৪ সাল। ২৩,২৪ ২৫ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা জেলার শীতকালীন শিবির। সেবাগ্রাম রোডের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শেঠ যমুনালাল বাজাজের খামার বাড়িতে তাঁবু খাটিয়ে শিবিরের ব্যবস্থা হয়েছে। শিবিরে ১৫০০ স্বয়ংসেবক অংশগ্রহণ করেছে। তখন পাশের সত্যাগ্রহ আশ্রমে গান্ধীজী অবস্থান করছেন। আশ্রমের ছাদ থেকে তিনি স্বয়ংসেবকদের শৃঙ্খলাবোধ দেখে শিবির দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। শিবিরের অধিকারী আপ্পাজী যোশীর সঙ্গে কথা বলে ঠিক হলো ২৫ তারিখ প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফেরার পথে গান্ধীজী শিবির পরিদর্শনে আসবেন।

গান্ধীজী আসবেন শুনে স্বয়ংসেবকরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়। সকাল ৬টার আগেই স্বয়ংসেবকরা পূর্ণগণবেশে সারিবদ্ধ ভাবে প্রস্তুত হলো। তাঁর সঙ্গে মীরা বেন ও মহাদেব দেশাই-সহ ৩০-৩৫ জন ছিলেন। স্বয়ংসেবকরা তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে কিছু ব্যায়ামযোগ দেখালেন। ১৫০০ স্বয়ংসেবকের শৃঙ্খলাপূর্ণ এই কার্যক্রম গান্ধীজীর এত ভালো লেগেছিল যে, তিনি আপ্পাজী যোশীর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, ‘আমি অত্যন্ত খুশি, দেশের কোথাও এই দৃশ্য দেখিনি’।

এই সময়ে সূর্যোদয় হয়েছিল। সঙ্ঘের ধ্বজোত্তোলন হলো। স্বয়ংসেবকরা সে সময় ‘দক্ষ’ স্থিতিতে শিষ্ট ও দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালেন। গান্ধীজীও সেই মতো দাঁড়িয়েছিলেন। স্বয়ংসেবকরা সঙ্ঘের রীতিতে ধ্বজপ্রণাম করলেন। গান্ধীজীও তাই করেছিলেন। এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। এক দেশনায়ক জনমনের নেতা ভোরের গৈরিক সূর্যালোকে গৈরিক পতাকাকে স্বয়ংসেবকদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে প্রণাম করছেন।

এরপর গান্ধীজীকে শিবিরের সকল বিভাগ ঘুরে দেখানো হয়। রান্নার জায়গায় ৫০ জনের মতো কাজ করছিলেন। তৈরি চাপাটি স্তূপ করে রাখা হচ্ছিল। রান্নার জায়গার পরিচ্ছন্নতা গান্ধীজীকে আকৃষ্ট করেছিল, তিনি বললেন, ‘সাধারণত রান্নার জায়গাটি আগোছালো, অপরিচ্ছন্ন থাকে। আপনাদেরটি তো অদ্ভুত ব্যতিক্রমী। খাওয়ার সময় কখন’?

‘এগারোটা থেকে বারোটা।’

মাত্র এক ঘণ্টায় সমগ্র শিবিরের খাওয়ার পাট চুকে যাবে এবং মাত্র একটাকা ও কিছু খাদ্যশস্যের বিনিময়ে স্বয়ংসেবকদের ৯ বেলার খাবার দেওয়া হবে, যদি কিছু ঘাটতি পড়ে স্বয়ংসেবকরাই তা পূরণ করে দেবেন — শুনে গান্ধীজী বিস্মিত হলেন।

এরপরে তিনি শিবিরের চিকিৎসাকেন্দ্রে গেলেন। দু’চার জন অসুস্থ স্বয়ংসেবকের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিলেন গ্রামের কৃষক ও শ্রমিকদের থেকেও স্বয়ংসেবক এসেছেন। শেষে তিনি থাকার জায়গা দেখলেন। একটি তাঁবুতে ঢুকে কথা বললেন।

ঃ ‘এই ইউনিফর্ম কে দিয়েছে?’

ঃ ‘আমরা নিজেরাই তা করি’

ঃ ‘পয়সা কে দিয়েছে?’

ঃ ‘আমাদের মা-বাবা’

ঃ ‘মা-বাবা একে পয়সার অপচয় বলে মনে করেন কি?’

ঃ ‘না। যদি কখনো এরকম ভাবেন, আমাদের বক্তব্য শোনেন, ইউনেফর্ম তৈরি করতে টাকা দেন। ইউনিফর্ম ছাড়া সঙ্ঘশিবিরে যোগ দেওয়া যায় না।’

ঃ ‘না,এই শিবিরের এমন কী আকর্ষণ রয়েছে যে, তোমরা এতে যোগ দেওয়ার জন্য পয়সা দাও, যাতায়াতের খরচ বহন করো, ইউনিফর্ম তৈরি করো।’

ঃ ‘কেন করি তা ঠিক বলতে পারবো না। কিন্তু এখানে আমরা আনন্দের সঙ্গে একসঙ্গে থাকি, খেলি, খাওয়া-দাওয়া করি, ঘুমোই, এতে আনন্দ পাই আর দেশের জন্যই তা করছি বলে মহৎ সুখও পাই।’ গান্ধীজী খুশি হলেন। এবার তিনি অন্যদিক দিয়ে প্রশ্ন করলেন। উত্তরে জানলেন এক স্বয়ংসেবক ব্রাহ্মণ, অন্যজন মরাঠি, একজন মাহার, চতুর্থজন তেলি। মাহারকে বাদ দিয়ে অন্য তিনজনকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমরা উঁচুজাতির লোক, কী করে মাহারের সঙ্গে থাকো, খাও, ঘুমোও? একে কি অপমান মনে করো না?’ স্বয়ংসেবকরা বললেন, ‘সঙ্ঘে আমরা এসব বিভেদ মানি না, আমরা জানি না, জানতেও চাই না পাশের স্বয়ংসেবকটি কোন জাতির। আমরা সকলেই হিন্দু, সকলেই ভাই। উঁচু-নীচুর ভেদ আমাদের মধ্যে নেই।’

গান্ধীজী এর উত্তরে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আপ্পাজী যোশীকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ কী করে এদের জাতপাতের ব্যবধান ভুলিয়ে দিয়েছেন। আমি এবং আরও কিছু সংগঠন তা করতে চেষ্টা করছি, কিন্তু মানুষ এই সব ভেদাভেদ টিকিয়ে রাখতেই চায়। একথা তো জানেন অস্পৃশ্যতা দূর করা কঠিন। তা সত্ত্বেও আপনারা সংগঠনের বৃত্তে এ কীকরে করেছেন?’

যোশীজী বললেন, আমরা সকল হিন্দুর মনে শুধু ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে চাই।

তা-ই সকল জাতপাতের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছে। এরজন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ডাঃ হেডগেওয়ারের।'গান্ধীজী অবাক হলেন।

এরপর প্রদর্শনী কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। সঙ্ঘের পক্ষে প্রয়োজনীয় সব জিনিসের প্রদর্শন সেখানে ছিল। একটি প্রবচনের প্রতি তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেন, 'একজন স্বয়ংসেবক স্বেচ্ছাশ্রমে নিযুক্ত এক কুলি নন, তিনি রাষ্ট্রের জন্য সর্বস্বদানের এক নায়ক।' এরপর গান্ধীজী ছবির দিকে দৃষ্টি দিলেন। সামনের একটি চৌপায়ায় ডাক্তারজীর ছবি ছিল।

ঃ 'চৌপায়ায় এ কার ছবি?'

ঃ পূজনীয় ডাঃ হেডগেওয়ারের।'

ঃ ইনিই কি তিনি, যাঁর কথা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কথায় বলেছিলেন? তাঁর সঙ্গে সঙ্ঘের কী সম্পর্ক? তাঁর সঙ্গে কি সাক্ষাৎ হতে পারে? সঙ্ঘ সম্পর্কে তাঁর কছে থেকে জানতে চাই।

ঃ ডাক্তার হেডগেওয়ার আগামীকাল শিবিরে আসছেন। আপনি যদি চান তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন।

তাঁর শিবের পরিদর্শন শেষ হয়ে এসেছিল। আপ্পাজী জিজ্ঞেস করলেন— শিবির দেখলেন, আমাদের কী কী ঘাটতি থেকে গেল দয়া করে বলুন।' 'কোনো ঘাটতি নেই, সব দিক দিয়েই চমৎকার কাজ করেছেন। যদি কোনো ঘাটতি থেকে থাকে তা হলো এই সংগঠন অন্য রিলিজিয়নের লোককে প্রবেশ করতে দেয় না।'

'অন্য রিলিজিয়নের কথা ওঠেও না' আপ্পাজী বললেন, 'হিন্দু সমাজই এদেশের জাতীয় সমাজ— তা নিজেই এত বিভক্ত, জাতপাত অঞ্চল ভাষাও হরেক রকমে —যে আমরা ভাবি এর মধ্যে যদি একতার ভাব দিতে পারি, অন্য সব সমস্যাই সহজে সমাধান হয়ে যাবে। সে জন্যই আমরা কেবল হিন্দুদের সংগঠিত করার দায়িত্ব নিচ্ছি। অন্য রিলিজিয়নের সম্পর্কে আমাদের কোনো ঘৃণা নেই। আমরা বিশ্বাস করি প্রত্যেকেরই নিজ ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে, অন্যের ধর্মের প্রতি

সহনশীলতা থাকা উচিত। যদি হিন্দুদের নিজ ধর্মই ঠিক না থাকে তাহলে কীকরে অন্য রিলিজিয়নকে ভালোবাসবে। আমরা মনে করি প্রথম কাজই হচ্ছে হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে তোলা। আমাদের ধারণায় এ হচ্ছে পবিত্র জাতীয় কর্তব্য। যদি এতে কোনো দোষ থাকে , দয়া করে দেখিয়ে দিন।' উত্তরে গান্ধীজী জানালেন,অন্যদের ঘৃণা না করে হিন্দুদের সংগঠিত করার মধ্যে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কিছু নেই। কিন্তু তিনি এই আদর্শের ভিত্তিভূমি নিয়ে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে কথা বলতে চান। কাজেই দেখা করার ব্যবস্থা হলে ভালো হয়।

২৫ ডিসেম্বর ডাক্তারজী শিবিরে পৌঁছলেন। আপ্পাজী যোশী তাঁকে গান্ধীজীর শিবির পরিদর্শনের কথা জানালেন। ডাক্তারজী খুব খুশি হলেন। বললেন, আমাদের কাজ ঈশ্বরীয়। হৃদয়বান জাতীয় নেতারা এ কাজে আশীর্বাদ না জানিয়ে পারেন না।'

আশ্রম থেকে স্বামী আনন্দ এসেছিলেন গান্ধীজীর আমন্ত্রণ নিয়ে। ঠিক হলো, পরদিন রাত ৮ টা ৩০মিনিটে দেখা হবে।

নির্দিষ্ট সময়ে ডাক্তারজী, ভোপাটকরজী ও আপ্পাজী আশ্রমে পৌঁছলেন। মহাদেব দেশাই তাঁদের গান্ধীজীর ঘরে নিয়ে গেলেন। গান্ধীজীও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। ডাক্তারজীকে নিজের পাশেই বসালেন। প্রায় এক ঘণ্টা দু'জনের মধ্যে আলোচনা

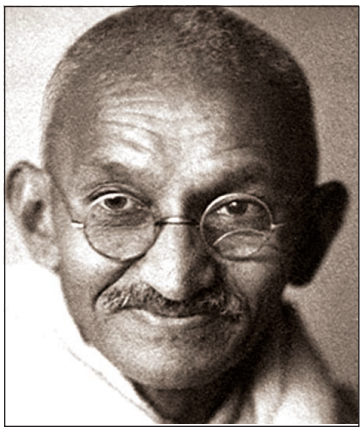

চলেছিল।

গান্ধীজী ঃ ডাক্তার সাহেব, গতকাল আপনাদের শিবিরে গিয়েছিলাম। সুনিপুণ ব্যবস্থা দেখে খুব ভালো লেগেছে।

ডাক্তারজী ঃ আপনার শিবির দর্শন স্বয়ংসেবকদের খুব ভাগ্যের কথা। আমি সে সময় ছিলাম না, দুঃখিত। আপনি শিবির দর্শনের অভিপ্রায় জানিয়েছিলেন, যদি জানতে পারতাম, উপস্থিত থাকতে চেষ্টা করতাম।

গান্ধীজী ঃ আপনার না থাকাটা একদিকে ভালোই হয়েছিল। আপনার অবর্তমানে আপনার সম্পর্কে কিছু জানার সুযোগ হয়েছে। বহু সংখ্যক শিবিরবাসী, তাঁদের পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। শিবিরের সমবেত বাদন ও গীত চমৎকার। আমি শুনতে ভালোবাসি। এই বাদন রাত ন'টার পর শুরু হয়। ন'টায় আমার শোয়ার সময়, তবু আমি শুনতে ছাদে যাই। আপনার ছেলেরা এত সুন্দর বাজাতে কী করে শিখেছে?

ডাক্তারজী ঃ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এক ব্যান্ডমাস্টারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম ছেলেদের শিখিয়ে দিতে।

গান্ধীজী ঃ এত মূল্যবান বাজনার যন্ত্রপাতি কেনেন, এত বড় শিবির করেন, কী করে টাকা তোলেন? স্বয়ংসেবকদের কাছে কি ফি নেন?

ডাক্তারজী ঃ সঙ্ঘে কোনো ফি বা চাঁদার নিয়মই নেই। আমরা গৈরিক ধ্বজকে গুরু

মানি। বছরে একবার গুরুপূজা করি। সেদিন গুরুদক্ষিণা হিসেবে প্রত্যেক স্বয়ংসেবক সাধ্যমতো ধ্বজকে অর্পণ করেন। এই গুরুদক্ষিণা কত হবে তারও কোনো নিয়ম নেই। এমন স্বয়ংসেবক আছেন শুধু ফুল দিয়ে পুজো করেন। এ ভাবেই আমাদের কাজ চলে। শিবিরের সব কাজ স্বয়ংসেবকরাই করেন। কাজেই আমাদের খরচ অনেক কম। স্বয়ংসেবকরা যা দেন তা দিয়েই কাজ চলে যায়।

গান্ধীজী ঃ এ তো আশ্চর্যের কথা! স্বয়ংসেবকরা নিজেদের ইউনিফর্ম তৈরি করান, যাতায়াতের ভাড়া নিজেরা বহন করে, শিবিরের ফিও দেয়। অন্য সংগঠনে বিনা মূল্যে এসব দিলেও ভলান্টিয়াররা শিবিরে যোগ দিতে চায় না। যদি আসেও, শৃঙ্খলা মেনে চলে না। স্বয়ংসেবকদের ক্ষেত্রে এসব কীকরে হয়?

ডাক্তারজী ঃ আমরা এসবের জন্য বিশেষভাবে কিছু করি না। আমরা মনে করি যদি কেউ আদর্শের প্রতি নিবেদিত হয়, তাহলে একজন তরুণ বহুকাজ করতে পারে। আমাদের স্বয়ংসেবকরা এসব কাজ আনন্দের সঙ্গে করে, মনেই করে না যে বিশেষ কোনো কিছু করছে। বরং এসব করার জন্য একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দেয়।

গান্ধীজী ঃ আপনারা শারীরশিক্ষা দেন। ভালো কাজ। কিন্তু সেই সঙ্গে কুচকাওয়াজ কেন? নির্দেশগুলিও ইংরেজিতে কেন?

ডাক্তারজী ঃ অভিজ্ঞতায় দেখেছি, কুচকাওয়াজ তরুণমনে শৃঙ্খলার ভাবটি দৃঢ় করে দেয়। নির্দেশ দেওয়ার বিষয়ে সংস্কৃতের ব্যবহার কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে।

গান্ধীজী ঃ স্বয়ংসেবকরা তাদের জিনিসপত্র পিঠে করে ৮-১০ মাইল বইতে পারে কিনা দেখেছেন?

ডাক্তারজী ঃ এখনও বেশিদূরের অভিজ্ঞতা হয়নি। মাইল দুই স্বচ্ছন্দে নিজেদের জিনিস বইতে পারে। ৮-১০ মাইল যাওয়া এখনও হয়ে ওঠেনি। আপনার পরামর্শ মূল্যবান।

গান্ধীজী ঃ শুনেছি ক্যাম্প ফি হিসেবে স্বয়ংসেবকরা একটাকা ও কিছু খাদ্যশস্য দেয়। তা দিয়ে আপনারা ন'বার খাওয়া-দাওয়া দেন, প্রতিবার ২-৩ আনা পড়ে। কী করে তা করেন? আমাদের তো অনেক খরচ করতে হয়।

এ সময়ে ভোপাটকরজী বললেন, ' এর কারণ আপনাদের সিস্টেমে রয়েছে। আপনারা বলেন 'কুটির', কিন্তু ব্যবস্থা থাকে রাজকীয়। আমি আজ স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে খেয়েছি, দেখেছি এদের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই। এদের অনুসরণ করলে আপনারাও ২-৩ আনায় একবেলার খাবার দিতে পারবেন। আপনারা সবকিছু আড়ম্বরে চান, অথচ অল্প খরচেও তা সারতে চান, তা কী করে সম্ভব হয়?

সকলে এই ছোট্ট ভাষণে হেসে ফেললেন। গান্ধীজী গায়ে মাখলেন না, বললেন, 'গতকাল দেখেছি সব জাতের হিন্দুরা এমনকী হরিজনরাও একসঙ্গে থাকছে, খাচ্ছে। এ দেখে আমি খুবই খুশি হয়েছি। কিন্তু জানি না কী করে তা সম্ভব করেছেন। এর জন্য সাফল্যের কোন পথ অনুসরণ করেছেন?'

ডাক্তারজী ঃ বিশেষভাবে কিছু না। সব হিন্দু ভাই— এই ইতিবাচক কথাটি তাঁদের সামনে রাখি। এই অনুভব থেকেই এ রকম মানসিকতা জাগে বলে আমার বিশ্বাস।

গান্ধীজী ঃ এই বিশেষ মানসিকতা গড়ে তুলতে কী কার্যক্রম আপনারা অনুসরণ করেন, তা জানতে আগ্রহী।

ডাক্তারজী ঃ নিশ্চয়ই। সঙ্ঘে এমন কোনো কাজ নেই যা আড়ালে রাখতে হয়। প্রতি সপ্তাহে আমাদের একটি বৌদ্ধিকবর্গ হয়। তাতে আমরা জাতীয় সংস্কৃতি, চরিত্র গঠন, ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ভালোবাসার ধারণা জাগাতে চেষ্টা করি। রামায়ণ, মহাভারত থেকে গল্প, ঐতিহাসিক ঘটনার কথা বলা হয়। আমি দেখেছি এতে স্বয়ংসেবকদের মধ্যে উন্নত ভাব ও তীব্র দেশপ্রেমের সঞ্চার হয়। এর বেশি আমরা আর কিছু করি না।

গান্ধীজী ঃ আপনি কোথায় শিক্ষাগ্রহণ করেছেন?

ডাক্তারজী ঃ নাগপুর থেকে ম্যাট্রিকুলেশন করি। সরকারের রোষে পড়াশুনায় বাধা সৃষ্টি হওয়ায় কলকাতা চলে যাই। সেখানে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ থেকে স্নাতক হই।

গান্ধীজী ঃ আপনার সংগঠন খুবই ভালো। শুনেছি দীর্ঘকাল আপনি কংগ্রেসে নেতা ছিলেন। কংগ্রেসের মতো জনপ্রিয় দলের মধ্যে এরকম একটি সংগঠন গড়ে তুললেন না কেন? আলাদা সংগঠন কেন গড়লেন?

ডাক্তারজী ঃ কংগ্রেসের মধ্যেই আমি প্রথম একাজ আরম্ভ করেছিলাম। আসলে ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবী বিভাগের সম্পাদক আমিই ছিলাম, ডাঃ পরাঞ্জপে ছিলেন প্রেসিডেন্ট। পরে প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতৃত্বে এই ধরনের একটি সংগঠন গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। তাই আলাদা সংগঠন গড় তুলেছি।

গান্ধীজী ঃ কংগ্রেসের ভিতর থেকে চেষ্ট সফল হলো না কেন? অর্থের অভাব হয়েছিল?

ডাক্তারজী ঃ না না। টাকাকড়ির কোনো অভাব ছিল না। টাকাকড়ি অনেকক্ষেত্রে কাজ সহজ করে দেয়। কিন্তু কেবল টাকার শক্তিতে কোনো কিছু সফল হয় না। এ টাকার বিষয় নয়। এ অনুভবের বিষয়।

গান্ধীজী ঃ আপনি কি বলতে চান যে, কংগ্রেসে উন্নতমনা লোক ছিলেন না বা নেই?

ডাক্তারজী ঃ কংগ্রেসে অনেক ভালো লোক আছেন। আমি নিজেও তো কংগ্রেসে ছিলাম। কিন্তু প্রশ্ন হলো মানসিকতা নিয়ে। কংগ্রেসের মানসিকতা একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যভিত্তিক। কংগ্রেসের কার্যক্রম ওই উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়, স্বেচ্ছাসেবীদের সেখানে কাজ করতে হয়। কংগ্রেস বিশ্বাস করে না যে, নিজেদের

উদ্দীপনায় কাজ করা একটি শক্তিশালী সংগঠনের সাহায্যে সমস্ত জাতীয় সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। কংগ্রেসের লোকেরা মনে করে যে, স্বেচ্ছাসেবীরা সভার টেবিল ঠিক করা ও শতরঞ্চি পেতে দেওয়ার শ্রমিক। জাতীয় প্রগতি সম্ভব করে তোলার নিবেদিতপ্রাণ কর্মী এই পরিবেশে কী করে গড়ে উঠতে পারে? কংগ্রেসের ভিতরে থেকে এই উদ্যোগ সফল না হওয়ার কারণ এটাই।

গান্ধীজী ঃ একজন স্বয়ংসেবক সম্পর্কে আপনার ধারণা তাহলে কী?

ডাক্তারজী ঃ আমাদের সংজ্ঞা অনুসারে স্বয়ংসেবক একজন নেতা। তিনি রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য নিজের সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। সঙ্ঘ এরকম স্বয়ংসেবক তৈরি করতেই উৎসাহী। এখানে কোনো নেতা ও স্বেচ্ছাসেবীর ব্যবধান নেই। আমরা সকলেই স্বয়ংসেবক। সকলেই সমস্তরের। কোনো ব্যবধান নেই। আর্থিক ও অন্যান্য সঙ্গতির অভাব সত্ত্বেও এত অল্প সময়ে সঙ্ঘ যে বিস্তার লাভ করেছে তার অন্তর্নিহিত কারণ এই-ই।

গান্ধীজী ঃ ভালো। আপনার কাজ সত্যিই জাতির স্বার্থে। শুনেছি সঙ্ঘ ওয়ার্ধা জেলায় ভালোই বিস্তার লাভ করেছে। মনে হয় যমুনালাল বাজাজের সহায়তায় তা হয়েছে।

ডাক্তারজী ঃ আমরা কারও কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিই না।

গান্ধীজী ঃ এত বড় সংগঠনের খরচ কী করে চালান?

ডাক্তারজী ঃ যেমন বলেছি, স্বয়ংসেবকরাই ক্রমাগত বেশি করে গুরুদক্ষিণা দিয়ে নিজেরাই দায় বহন করেন।

গান্ধীজী ঃ আশ্চর্য, আপনারা কি কারও থেকেই টাকা নেবেন না!

ডাক্তারজী ঃ নেব। যখন সমাজ নিজ উন্নতির জন্য প্রয়োজন মনে করবে, কেবল তখনই। তখন আমরা না চাইলেও সমাজ সঙ্ঘের ভাণ্ডার ভরে দেবে। সে রকম সহায়তা নিতে আমাদের আপত্তি হবে না। কিন্তু, বর্তমানে আমরা নিজেদের উপরেই নিজেরা নির্ভর করার নীতিতে রয়েছি।

গান্ধীজী ঃ তা হলে এ তো আপনাদের সারা সময়ের কাজ। আপনি ডাক্তারি প্র্যাকটিস কী করে চালান?

ডাক্তারজী ঃ আমি আদৌ প্র্যাকটিস করি না।

গান্ধীজী ঃ তাহলে পরিবার প্রতিপালন করেন কীভাবে?

ডাক্তারজী ঃ আমার কোনো পরিবার নেই। আমি বিয়ে করিনি।

গান্ধীজী ঃ (কিছু সময়ের জন্য চমকিত হয়ে রইলেন। তারপর বললেন) তাই বলুন। এত অল্প সময়ের মধ্যে কী করে সফল হয়েছেন তার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খুবই আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু একটি প্রশ্ন — এত বড় সংগঠন চালাচ্ছেন, এর নিশ্চয় কনস্টিটিউশন রয়েছে, তা দেখতে চাই। আপনার সুবিধা অনুযায়ী তা পাঠিয়ে দিতে পারেন।

ডাক্তারজী ঃ আমাদের আদৌ কোনো কনস্টিটিউশন নেই। পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করেই সংগঠন চালানো হয়। কোনো কিছু লিখে রাখার প্রয়োজন হয় না। ঈশ্বরের আশীর্বাদে কাজে অগ্রগতি হচ্ছে। কিন্তু শাখা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখার প্রয়োজন মনে হচ্ছে। এখনও কোনো কনস্টিটিউশন তৈরির প্রয়োজন হয়নি। যদি প্রয়োজন হয় ভাবতে হবে।

গান্ধীজী ঃ আমারও এরকম ধারণা ছিল। কিন্তু দেখছি এ অসম্ভব। বাস্তবিক আমাকে অনেক কিছু লিখতে হয়। একদিন না একদিন আপনাকেও তা করতে হবে। আপনি যে উন্নত ভাব নিয়ে সংগঠন গড়ছেন, যে আশ্চর্য শৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন তা দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আন্তরিকভাবে আপনাদের সাফল্য কামনা করি। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে প্রশ্নের ব্যাখ্যা করার জন্য ধন্যবাদ।

ডাক্তারজী ঃ আপনার মতো সাধুপুরুষের আশীর্বাদই আমাদের শক্তি। আপনার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ আমার কাছে আনন্দের বিষয়।

(বিশিষ্ট লেখক প্রয়াত অশোক দাশগুপ্তের 'আর এস এস কী ও কেন?' পুস্তক থেকে সংগৃহীত)

এই সময়

জলের দাম

আমেরিকার জলের দাম ক্রমশ বাড়ছে। তাই সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে শিক্ষা দিতে ফ্লোরিডার ডানা

ম্যাককুল অভিনব উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি ৪৯৩ ডলারের বিল পেমেন্ট করার জন্য ব্যাগভর্তি খুচরো নিয়ে যান। ব্যাগে মোট ৪৯, ৩০০টি কয়েন ছিল। ঠেলা বুঝেছেন কর্তারা।

সুশিক্ষক

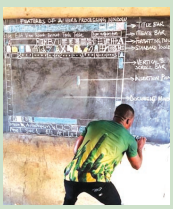

স্কুলে কম্পিউটার নেই। কুছ পরোয়া। ঘানার তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষক ওউরা খোয়াডুয়ো ব্ল্যাকবোর্ডেই তাঁর ছাত্রদের এম এস ওয়ার্ল্ড শেখান। কম্পিউটার স্ক্রিনের লে আউট তিনি বোর্ডে এঁকে নেন। তারপর সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দেন ছাত্রদের। সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে তার ফেসবুক পোস্ট। সারা বিশ্ব কুর্নিশ জানিয়েছে তাঁকে।

টাক

ট্রাম্পের মুখে রসিকতা! তাও আবার নিজেকে নিয়ে? ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। সম্প্রতি

রক্ষণশীলদের এক সভায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিজের টাক নিয়ে রসিকতা করেন। তিনি বলেন, 'টাক ঢেকে রাখার জন্য আমি খুব খাটছি। কিন্তু ঢাকা পড়ছে না।'

সমাবেশ -সমাচার

মালদা নেতাজী সুভাষ রোডের সরস্বতী শিশু মন্দিরে মাতৃ-পিতৃ পূজন

গত ১২ ফেব্রুয়ারি মালদহের শ্যামাপ্রসাদ ভবনে মালদহের নেতাজী সুভাষ রোডস্থিত সরস্বতী শিশু মন্দিরের মাতৃ-পিতৃ পূজন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক ড. তুষারকান্তি ঘোষ এবং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় কার্যকারিণীর সদস্য সত্যনারায়ণ মজুমদার। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের বিভাগ সঙ্ঘচালক সুভাষ কুমার দাস এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের কার্যকারী সভাপতি বিদ্রোহী কুমার সরকার।

এই মহতী অনুষ্ঠানে ২৬০ জন অংশগ্রহণ করে। অতিথি ও সভাপতির ভাষণও সকলকে অনুপ্রাণিত করে। এই কার্যক্রমের প্রেরণাদাতা হলেন মালদা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক অজয় কুমার ঝা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পরেশ চন্দ্র সরকার। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সরস্বতী শিশু মন্দিরের পরিচালন সমিতির সম্পাদক গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল।

নাগপুরে 'ভারত-ভারতী স্নেহ মিলন'

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি নাগপুর মহানগরের স্বয়ংসেবকরা বিভিন্ন ভাষাভাষী স্বয়ংসেবকদের নিয়ে রেশমবাগ পুণ্য পরিসরে পারিবারিক স্নেহ মিলনের আয়োজন করে। নাগপুর মহানগরে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের লোকেরা দীর্ঘদিন বসবাস করছেন চাকুরি বা ব্যবসা সূত্রে। আহার, পোশাক ও ভাষার বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও সকল ভারতবাসী একই ভারতমায়ের সন্তান এই ভাবকে উজ্জীবিত করার উদ্দেশেই এই সম্মেলন। ২ মাস আগে থেকে ৬টি ভাষার (দক্ষিণের ৪টি, বাংলা, ওড়িশা) ১০ জন কার্যকর্তাকে নিয়ে একটি সমিতি তৈরি করা হয়, যাঁরা নিজ নিজ ভাষা অনুসারে পরিচিত জনদের সময়মতো হাজির করেছেন। মহর্ষি ব্যাস সভাগৃহে শুরুতে ৬০০ জন উপস্থিত থাকলেও পরে পুরুষ-মহিলা মিলে ১৩০০ জন অংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে বাংলা, ওড়িশা, কেরল, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্র থেকে একজন করে নির্বাচিত অভিজ্ঞ কার্যকর্তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বাংলা থেকে তিলক রঞ্জন বেরা অংশ নিয়েছিলেন। উদ্বোধন কার্যক্রমে নাগপুর মহানগরের সঙ্ঘচালক প্রদীপ প্রজ্বলন করেন, সহ-সঙ্ঘচালক কার্যক্রমের ভূমিকা ব্যক্ত করেন। দ্বিতীয় সত্রে ৩০ মিনিটের

এই সময়

পুলওয়ামায় ফিদায়েঁ

জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার সিআরপিএফ ক্যাম্পে ফিদায়েঁ হামলার

অভিযোগে জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এন আই এ) একটি মামলা দায়ের করেছে। ওই হামলায় পাঁচজন মারা যান। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশেই এই পদক্ষেপ। গত বছর ৩০ ডিসেম্বর হামলা চালায় জঙ্গিরা।

ভারতে জর্ডনের রাজা

'জর্ডনের রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লাহ্‌কে ভারতে স্বাগত জানাই। আম্মানে আমরা কিছুক্ষণ কথা বলেছিলাম। তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হওয়া

সত্যিই আনন্দের। দু'দেশের সম্পর্ক এই সফরে আরও শক্তিশালী হবে।' জর্ডনের রাজাকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানিয়ে এ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দ্বিতীয় আবদুল্লা ভারতে ৩ দিন থাকবেন।

এক জাতি এক নির্বাচন

নরেন্দ্র মোদীর 'এক জাতি এক নির্বাচন'-এর ভাবনাকে সমর্থন করে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী

বিজয় রুপানি বলেছেন, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্তরের নির্বাচন একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হলে তা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। নির্বাচনের যুক্তিতে উন্নয়ন প্রকল্পগুলি ব্যাহত হবে না।

সমাবেশ -সমাচার

জন্য ভাষা অনুসারে পরিচয়াত্মক বৈঠক হয়, যেখানে আমন্ত্রিত প্রতিনিধি নিজের প্রান্তের সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সকলকে অবহিত করান এবং ভাব আদান প্রদান হয়। বিভিন্ন ভাষায় মেয়েরা শিব, শক্তি, কৃষ্ণের সাধনায় নৃত্য পরিবেশন করে। সবশেষে

সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী বৌদ্ধিকের মাধ্যমে আমরা সকলে ভারতীয়, ভারতবর্ষ এক, একই মায়ের সন্তান— এই ভাব প্রকট করেন। আমাদের বাহ্যিক বিবিধতা— বিভেদ নয়, বৈচিত্র্যের, আনন্দের প্রকাশ। মহানগর সঙ্ঘচালক আহ্বান করেন এরকম সম্মেলন ভারতের বিভিন্ন শহরে প্রসারিত করলে ভালো হবে।

শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে 'বিবেকানন্দ সেবা সম্মান'

কলকাতার প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক-সামাজিক সংস্থা শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ৩২তম বিবেকানন্দ সেবা সম্মান রাজস্থানের বাঁসওয়াড়া পরিযোজনা প্রমুখ বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীরাম স্বরূপ মহারাজকে প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে

সভাপতিত্ব করেন ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের নির্দেশক রাজেশ পুরোহিত। প্রধান বক্তারূপে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা এবং বিশিষ্ট অতিথিরূপে সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু উপস্থিত ছিলেন। বনবাসী ক্ষেত্রে সমাজ উন্নয়নের কাজে রত শ্রীরামস্বরূপ মহারাজকে শাল, শ্রীফল, মানপত্র এবং এক লক্ষ টাকার চেক সম্মানস্বরূপ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কুমারসভার সম্পাদক মহাবীর বাজাজ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার অধ্যক্ষ ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। অনুষ্ঠানে কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

এই সময়

কৃষকের ভাগ্য

'আপনি যদি ভারতের ভাগ্য পাল্টাতে চান তাহলে কৃষকদের ভাগ্য পাল্টাতে হবে।' বক্তা

নরেন্দ্র মোদী। কর্ণাটকের দেবনাগের অঞ্চলে কৃষকদের একটি সমাবেশে তিনি একথা বলেন। এদিন তিনি কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বি.এস. ইয়েদ্দুরাপ্পার জন্মদিনে তাকে একটি লাঙল উপহার দেন।

স্বজল

সম্প্রতি রাজস্থানে স্বজল পাইলট প্রকল্পের উদ্বোধন হয়ে গেল। পানীয় জল সমস্যার

সমাধানে এই প্রকল্পের ভাবনা। আপাতত বিক্রমপুরা এবং কারাউলি গ্রামে সারাক্ষণ মিলবে পানীয় জল। তারপর ধীরে ধীরে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হবে এই সুবিধা।

কার্তির কীর্তি

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতা পি. চিদাম্বরমের ছেলে কার্তিকে গ্রেপ্তার করেছে

সিবিআই। আই এন এস মিডিয়া মানি লন্ডারিং-এর মামলায় এই গ্রেপ্তার। উল্লেখ্য, আই এন এস মিডিয়ার বিরুদ্ধে বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত আইন ভঙ্গের অভিযোগ রয়েছে।

সমাবেশ -সমাচার

বিদ্যাসাগর সোসাইটি ফর স্কুল এডুকেশন অ্যান্ড কালচারের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন বেসরকারি স্কুলের ২০০রও বেশি ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় বিদ্যাসাগর সোসাইটি ফর স্কুল এডুকেশন অ্যান্ড কালচার-এর দশম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

গ্রাম্য সংস্কৃতির বর্ণময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার শুভারম্ভ হয়। তারপর সারাদিন ব্যাপী চলে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বহড়াকোঠা বি. বি. মাল্টিপারপাস স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত এই কার্যক্রমে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সম্পাদক অপরেশ ব্লিশ, সভাপতি অরুণ গোস্বামী, মানিকপাড়া বিট হাউসের এস. আই. সিঞ্জন হেমব্রম প্রমুখ। শেষে বিজয়ী প্রতিযোগিদের হাতে 'শংসাপত্র' ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচারে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সন্ধ্যা

রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচারে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল মনোজ্ঞ, শ্রুতিমধুর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর। মিশনের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কলকাতার অগ্রণী ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ই আই আই এল এম। নব প্রজন্মের চার বাদ্যযন্ত্র শিল্পীর অনায়াসলব্ধ কিন্তু পরিশীলিত রেওয়াজির সুরবাহার প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত সঙ্গীত পিপাসুকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুধারসে জারিত করে। প্রথম পর্বে ছিল মিশনেরই শিক্ষাপ্রাপ্ত ফরাসি সেতার শিল্পী ভিক্টর মরিয়াস রেলিসিউর সঙ্গে তবলাবাদক অমিত চট্টোপাধ্যায়ের যুগলবন্দি। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সাঙ্গীতিক মেলবন্ধনকে চমৎকার ভাবে উপস্থাপিত করেন দুই তরুণ প্রতিভা। এর পরে ছিল সরোদিয়া অপ্রতীম মজুমদার ও তবলিয়া অভিরূপ রায়ের যুগলবন্দি। আলাপ থেকে গমক হয়ে বিস্তার পর্যন্ত রাগরাগিণীর মায়াজাল ছড়িয়ে দিয়ে যান দুই শিল্পী। এই প্রসঙ্গে কালচারের সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দ বলেন, 'ভারতের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যশালিনী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের যে ধারা, তার প্রবহমান স্রোতকে সঠিক দিশায় টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম এই চার নব তরঙ্গ।' সবশেষে ই আই আই এল এমের পক্ষে বিভাগীয় প্রধান সঙ্গীত বোদ্ধা সুপ্রিয় পাল তবলা ও সরোদ প্রতিভাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রীর প্রচারমাধ্যম সংক্রান্ত সমস্যাটা বাড়ছে

অতিথি কলম

তভলিন সিংহ

ঠিক যেদিন আর একজন কপট ব্যবসায়ী সরকারি ব্যাঙ্কগুলি থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা দেনা করে তা না মেটানোর অভিযোগে শনাক্ত হলেন, সেদিনই কাকতালীয় ভাবে প্রধানমন্ত্রীকে সকালবেলাটা বিদ্যার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তায় কাটাতে দেখা গেল। হ্যাঁ, অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীর এই ধরনের অনুষ্ঠান বহু আগে থেকেই নির্ধারিত রাখা হয়। তবুও এই বারের ব্যাঙ্ক জালিয়াতিটির পরিসর এত বড় যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এই বিষয়টি পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারে না। অন্যদিকে সরকারের তরফে অনেকেই নানা মন্তব্য করেছেন, কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। মনে রাখতে হবে, মোদীর সরকারে আসার প্রথম দিককার সেই জাদু আকর্ষণের তীব্রতা এখন বেশ কিছুটা স্বাভাবিকভাবেই কমে এসেছে, আর সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয় অনুভব করছেন যে, সব কিছু একার হাতে নিয়ে মিডিয়াকে পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী মোদী সাংবাদিকদের পছন্দ করেন না। তিনি শুধু নয় আমরা সকলেই জানি যে, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দিন থেকে তারা কখনই তাঁর প্রতি সদয় ছিল না। ন্যায্য ব্যবহার তারা কখনই তাঁর সঙ্গে করেনি। এই মাৎস্যন্যায় ভয়ঙ্কর প্রকট হয়ে দেখা দেয় ২০০২-এর গোধরা-পরবর্তী সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পরে পরেই। সাংবাদিকরা তাঁর সম্পর্কে এমন সব প্রচার চালাতে থাকে যেন স্বাধীন ভারতে (১৯৪৭-এর পর) এই প্রথম কোনও দাঙ্গা সঙ্ঘটিত হলো। এমনটা হতে পারে যে, হয়তো তাদের ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছ ছিল না বা তাদের এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় গবেষণায় খামতি ছিল, তবু শেষমেশ তাদের আচরণ নিঃসন্দেহে ছিল অন্যায্য। তারা এতদূর পর্যন্ত স্পর্ধা দেখিয়েছিল যা কিছু হিংসাত্মক হানাহানি হয়েছে তার সবই মোদীর মস্তিষ্কপ্রসূত পরিকল্পনা। এর চেয়ে বেশি অন্যায় আর কী হতে পারে? এরই পরিণতিতে সেই সমস্ত দেশ যারা অনায়াসে বহু দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বা সেই অর্থে একজন প্রধানমন্ত্রী যিনি সরাসরি কোনও একটি ব্যাপক দাঙ্গার পক্ষ নিয়েছিলেন তাদের দেশে যাওয়ার ভিসা দিয়েছিল, তারাই অনায়াসে মোদীকে তাদের দেশে ঢোকার ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করে।

তবু, বলতে হবে এ বিষয়টা এবার হালকা করে দেখার সময় হয়েছে। কেননা এর অন্যথায় প্রধানমন্ত্রী বাস্তবে প্রচারমাধ্যমে বন্ধুহীন হয়ে পড়বেন। বিশেষ করে এমন একটা সময়ে যখন মিডিয়াতে তাঁর চাটুকার নয়, যথার্থ শুভার্থী দরকার।

আমরা সকলেই জানি মোদীর মতো জন-সংযোগ ক্ষমতার অধিকারী বিরল। সেই সুবাদে নিদেনপক্ষে একটা প্রেস কনফারেন্স না করাটা মেনে নেওয়া কষ্টকর। নীরব মোদী কেলেঙ্কারি পরিষ্কার ইঙ্গিত করছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে এই সুযোগে একটি অধুনালুপ্ত মিডিয়া সেল অবশ্যই খোলা দরকার। এই সেল বিশেষ করে এই ধরনের কেলেঙ্কারিকে যথাযথভাবে প্রচারমাধ্যমে তুলে ধরে সঠিক চিত্র পরিবেশন করতে পারবে। মানুষ সঠিক তথ্য পাবে। সাম্প্রতিক কালের প্রধানমন্ত্রীদের দপ্তরের মধ্যে নরেন্দ্র মোদীর মতো মিডিয়া-বিচ্ছিন্নতা আর কোনও রাষ্ট্র প্রধানের দপ্তরে দেখা যায়নি। মিডিয়ার অনুপ্রবেশের কোনও অবকাশই প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে নেই। এর অনিবার্য কুফলে নানান প্রচারমাধ্যমে বিচিত্র সব কাহিনি উড়ে বেড়াচ্ছে, যেগুলিকে সঠিক কিনা বলে দেবার বা চ্যালেঞ্জ করার কেউ নেই। কখনও বাজারে চলছে এই এই অপরাধে সম্পাদকের চাকরি গেল, এই ভাবে

> “আজকের ভারতের অনেক রাজ্যেই ব্যাঙ্ক ঋণের তুলনামূলক অকিঞ্চিৎকর টাকা না মেটাতে পেরে কৃষক আত্মহত্যা করছে। নীরব মোদীর পটভূমিতে এই ইস্যুটি নির্বাচন যত নিকটবর্তী হবে ততই বড় করে দেখাবার চেষ্টা হবে। এটি অত্যন্ত সহজ নির্বাচনী প্রচার অস্ত্র হওয়ার ক্ষমতা রাখে। তাই প্রধানমন্ত্রী সময় থাকতে নিদেন পক্ষে ছাত্রের কথা মতো কিছুটা নার্ভাস হয়েই না হয় মিডিয়া সংক্রান্ত নতুন পথ ধরুন।”

খবর তুলে ধরার অভিযোগে টিভি সঞ্চালক কাজ খোয়ালেন। এগুলো মূলত শোনা যাচ্ছে যাঁরা সাহস করে কিছু সত্য বলার চেষ্টা করছেন তাদের ক্ষেত্রে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর তরফে মিডিয়াকে দুর ছাই করার অগুনতি লাগামছাড়া অভিযোগ ছড়িয়ে পড়ছে।

প্রধানমন্ত্রীর হয়তো বিবেচনা করা উচিত এখন মিডিয়ার সঙ্গে সংযোগ বাড়াতে পারলে অর্থাৎ যদি তারা সহজে তাঁর কাছে আসতে পারে তাহলে তাঁরই উপকার হবে। যেমন ধরুন, সাংবাদিকদের এড়িয়ে না চলে তাদের মাধ্যমে তিনি সহজে বোঝাতে পারতেন যে এই সাম্প্রতিক কেলেঙ্কারির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের কথা সিরিয়াস ভাবে চিন্তা করা যায় কিনা। হিরে কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে একটা জিনিস কিন্তু ভাবাই যায় না যে, এটা যদি কোনও বেসরকারি ব্যাঙ্ক হতো তাহলে কিছু অফিসারকে বাগে এনে এই ভাবে হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করে অত সহজেই ভেগে পড়া যেত, যেমনটা সরকারি ব্যাঙ্ক হওয়ায় ঘটেছে। এছাড়া রাজনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও বেশ কিছু অত্যন্ত জরুরি সংস্কার দরকার। কিন্তু এমনটা হতে পারে এই আক্রমণাত্মক নেতিবাচক মিডিয়া প্রচারের আশঙ্কায় তিনি তাতে হাত দিতে দ্বিধা করছেন। এটা অবশ্যই মানতে হবে তাদের তরফে একটা দ্বিতীয় মোদী বিরোধিতা সদা সক্রিয়, তার একটা বড় কারণ কিন্তু মোদীর তরফেও তাদের প্রতি চরম উপেক্ষা।

মোদী মনে হয় বিশ্বাস করেন যে, তাঁর পক্ষে নিয়মিত মিডিয়ার সঙ্গে মোলাকাত করার কোনও দরকার নেই, কেননা তাঁর কাজের মাধ্যমে তিনি ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি মিডিয়া প্রিন্ট অথবা বৈদ্যুতিন কর্তাদের তাঁর লাইনে আসতে বাধ্য করেছেন। কিন্তু এটা এতই চোখে পড়ার মতো যে, এর মাধ্যমে কোনও উদ্দেশ্য সাধন হবে না। এই পরিস্থিতিতে মিডিয়ার গুরুত্ব ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। এই সময়টা নিশ্চয় কঠিন সময় বিশেষ করে নীরব মোদী কাণ্ডের পর ভয়ঙ্কর কঠিন সময় শুরু হতে পারে।

যেকথা প্রথমে শুরু করেছিলাম অর্থাৎ ছাত্রদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলাপচারিতার সময় একটি ছাত্র হঠাৎ প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করে যে, তিনি কি আসন্ন ২০১৯-এর ভোট পরীক্ষার জন্য কোনওভাবে নার্ভাস বোধ করছেন? তিনি প্রশ্নটি হেসে উড়িয়ে দিয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেন। মোদী বলেন, আমি যদি পরীক্ষার আগে তোমার শিক্ষক হতাম তাহলে আমি তোমাকে ভবিষ্যতের সাংবাদিক হওয়ার তালিম দিতাম। কেননা তোমার মতো প্যাচানো প্রশ্ন একমাত্র সাংবাদিকরাই করে থাকে।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর বেশ কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার সময় হয়েছে, না হলে কিন্তু দেরি হয়ে যেতে পারে। ওই প্রশ্নটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে নিরেট বাস্তব পরিস্থিতির কড়া ইঙ্গিত। এই প্রসঙ্গে দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা ও ভাষ্য লেখার জগতে জড়িত থাকা আপনার একজন যথার্থ শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আমি ছোট একটি নিবেদন রাখতে চাই। আমি এই প্রথম দিল্লির রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কানাঘুষো শুনছি যে, ২০১৯-এ যদি এমনটা হয় বিজেপি ২০০ আসনের কম পেল? এই নিয়ে বড় বড় জল্পনা, বাজি ধরা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে— কী ঘটতে পারে। যদি ঘটে তাহলে কে বাইরে থাকবে কেই বা আসবে ভেতরে ইত্যাদি আকাশকুসুমের পাহাড় গড়া হচ্ছে— তার খোঁজ খবর চলছে। একটা হাওয়া তোলার চেষ্টা চলছে যে আপনি হয়তো ফিরছেন না।

তাই আবার বলছি, নীরব মোদী কেলেঙ্কারি একটা অত্যন্ত অশুভ সময়ে ঘটেছে। শুধু তাই নয়, যেহেতু সে ও তার পরিবার ভারতের বাইরে থাকে, তাই তাদের ফেরানো দুরূহ তাই এই তদন্ত কিছুটা গড়িয়েই থেমে যেতে বাধ্য। এর কোনও অন্তিম গন্তব্য নেই। ভাবতে হবে, আজকের ভারতের অনেক রাজ্যেই ব্যাঙ্ক ঋণের তুলনামূলক অকিঞ্চিৎকর টাকা না মেটাতে পেরে কৃষক আত্মহত্যা করছে। নীরব মোদীর পটভূমিতে এই ইস্যুটি নির্বাচন যত নিকটবর্তী হবে ততই বড় করে দেখাবার চেষ্টা হবে। এটি অত্যন্ত সহজ নির্বাচনী প্রচার অস্ত্র হওয়ার ক্ষমতা রাখে। তাই প্রধানমন্ত্রী সময় থাকতে নিদেন পক্ষে ছাত্রের কথা মতো কিছুটা নার্ভাস হয়েই না হয় মিডিয়া সংক্রান্ত নতুন পথ ধরুন। ■

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ

বার্ষিক সম্মেলন

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের উদ্যোগে আগামী ১৮ মার্চ ২০১৮, রবিবার (সকাল ৮-৩০-বিকাল ৪-৩০) কল্যাণ ভবন, ২৯ ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন স্ট্রিট, মানিকতলা (পোস্ট অফিস সন্নিকট), কলকাতা-৬-এ বার্ষিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এই সম্মেলনে প্রত্যেক হোমিও চিকিৎসক, ছাত্র ও অনুরাগীদের যোগদানের আবেদন জানাই।

শুভেচ্ছাসহ—
ডাঃ সুকুমার মণ্ডল
সভাপতি

যোগাযোগ
ডাঃ ভাস্কর হাজরা—৯৪৩২৪৬০৪১০
ডাঃ অর্পণ চৌধুরী—৯৬৪৭৬৫৬২৪৫
ডাঃ রাজীব রায়—৯৪৭৪৩৬৫৮১৫

লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন— এই প্রবাদবাক্যটি আগে ছিল কথার কথা, আজ কিন্তু তা জ্বলন্ত বাস্তব।

রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি, সহজপাঠের অবলুপ্তি ঘটানো, বিবেকানন্দকে মিশনারি সাধু ও নেতাজীকে তোজোর কুকুর বলা, সিপিএম নির্বাচনে বাংলা থেকে উৎখাত হবার সময়ে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গকে দুই লক্ষ আটষট্টি হাজার কোটি টাকা ঋণজালে পতিত করে গেছে। তাহলে প্রশ্ন, রাজকোষ যদি দেনার দায়ে শূন্য থাকে তাহলে সেই রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে তুষ্ট করার জন্য ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের মাসিক ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন কী করে? প্রথমে মুসলমান ছাত্রীদের সবুজ সাথী প্রকল্পে সাইকেল প্রদান, তারপর সকলকেই সাইকেল প্রদান করার টাকা পেলেন কোথায়?

পশ্চিমবঙ্গের ক্লাবগুলিকে ২ লক্ষ, পরে আবার এক লক্ষ করে টাকা দিয়ে তিনি যে তাদের হাতে রাখার ব্যবস্থা করে চলেছেন শুধু নয়, আবারও ৪৩০০ ক্লাবকে নতুন করে মোট ৮৬ কোটি টাকা যে দিলেন, প্রত্যক্ষ পরোক্ষ করদাতাগণের জিজ্ঞাস্য হতেই পারে, অত টাকা কোথায় পেলেন? তাহলে কি ধরে নেওয়া যেতে পারে নোট ছাপার কল থাকলে এটা সম্ভব, নাহলে আজ যারা জেলে ভর্তি আছেন তাদের অবদান কি স্বীকার্য নয়?

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে বলি, পশ্চিমবঙ্গের রাজকোষ শূন্য করে যেভাবে অর্থের নয়ছয় করা হচ্ছে তা কি একটু তদন্ত করে দেখবেন? মুখ্যমন্ত্রীর অনুগ্রহ লাভ করছে যেসব ক্লাব তাদের কেউ কেউ একই সঙ্গে দুটি তিনটি ক্লাবের সভ্য, আবার কোনও কোনও কাল্পনিক নাম খাতায় লিখে অর্থের অনুগ্রহ লাভ করছে। এটাকেই বলে অর্থের অপচয় বা নয়ছয়।

একটা কথা আছে— ''ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করা যায়, যুদ্ধে জেতা যায় না।'' আজ যে ক্লাবকে টাকা দেওয়া হচ্ছে নিজেদের অনুকূলে নির্বাচনে জেতার জন্য তাদের মনের এক্সরে তো করা যাবে না। তাই তারা যে শতকরা ৩০ শতাংশ অনুকূলে ভোট দিতে পারে, কিন্তু ৭০ শতাংশ দেবে না একথা হলফ করে বলতে পারা যায়। কারণ পূর্বে তারা সকলেই ছিল ৩৪ বছরের সিপিএমের আজ্ঞাবহ দাস, আজ তারা অর্থের লালসায় শাসকদলের অনুগত হচ্ছে বাহ্যিক ভাবে। কেননা সেই সিপিএম ভক্তরা আন্তরিকভাবে ভোট না দিলে বর্তমান শাসকদল ক্ষমতায় আসতে পারত না। পূর্বের ঘটনার যে পুনরাবৃত্তি ঘটবে না এটা হলফ করে কেউ বলতে পারবে না। তাই পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নয়ছয় না করে ওই টাকায় উন্নয়ন করলে ভালো হয়। কারণ অর্থ দিয়ে হয়তো অনেককিছুই কেনা যায়, কিন্তু মানুষের মন কেনা যায় না।

—**দেবপ্রসাদ সরকার,**
মেমারী, বর্ধমান।

তোষণ সমাজে হিংসার বীজ বপন করছে

ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার তকমা থাকলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় ধর্মনিরপেক্ষতার কারণে বিশেষ এক সম্প্রদায় ফায়দা নিচ্ছে বা দেওয়া হচ্ছে। দেশের যে-কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের বদনাম করা হয়, কিন্তু সত্যটা অন্যরকম। নিজের দেশে কাশ্মীরি পণ্ডিতরা বাস্তুচ্যুত, দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী খোদ কাশ্মীরি পণ্ডিত (?) হয়েও তাদের এই অবস্থা। এরকম ঘটনা সারা দেশে দুর্লভ হলেও ভারতবর্ষে সম্ভব। সম্প্রতি কয়েকটি হিংসার কথা উল্লেখ করি।

দেশে অসহিষ্ণুতা বা হত্যা যে-কোনও সম্প্রদায়েরই হোক না কেন ঘোর নিন্দনীয়। কিছুদিন আগেও রাজস্থানে আফজাজুল নামে পশ্চিমবঙ্গের এক মুসলমানকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করা হয়। প্রত্যেক

রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিজীবী মহল ঘটনাটির ঘোর নিন্দা করে। দেওয়া হয় তার পরিবারকে সরকারি চাকরি-সহ অন্যান্য সুবিধা। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে আমরা সবাই কি বলতে পারবো একই মানবিক দৃষ্টি দেওয়া হয় চন্দন গুপ্তা, অঙ্কিত সাকসেনাদের পরিবারকেও? আশ্চর্য হলেও সত্যি কাশগঞ্জের চন্দন হত্যার অভিযুক্তের হয়ে খোদ আদালতে লড়বেন কংগ্রেসের কপিল সিব্বাল। মিডিয়া, বুদ্ধিজীবী মহল, ধর্মনিরপেক্ষ গ্যাং কারোর তখন আর হিংসা নজরে পড়ে না। এটাই কি ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রকৃত নজির!

বাক্‌স্বাধীনতা ভারতের সংবিধানের আরেকটি অসাধারণ উপহার, কিন্তু এর বিকৃতি কীভাবে হচ্ছে তা জানা দরকার। কিছুদিন আগে সোনু নিগম আজানের চিৎকারে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। সোনুর হয়তো এটা দুঃসাহসই বলা যায়, কারণ এর ভূত তাঁকে এখনো তাড়া করছে। তাঁকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়েছে। তাহলে কি আমরা বলতে পারি একজন মানুষের মত প্রকাশের অধিকার আছে? প্রকৃতপক্ষে না। মৌলবাদী শক্তির কাছে ভারত ধীরে ধীরে নতিস্বীকার করতে চলছে। দেশে তালাক প্রথা নিষিদ্ধ করার জোর প্রয়াস চলছে। ভারতের আইন কি মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড পরিচালিত করবে! আমরা সবাই গলা ফাটিয়ে বলি, রাজনীতিতে ধর্ম নয়, উন্নয়ন আগে। দেখা যায় নির্বাচনে ধর্মই মূল ফ্যাক্টর, উন্নয়ন পরে। জনপ্রতিনিধিদের টিকিট বিতরণ থেকে শুরু করে সমস্ত রাজনৈতিক পাটিগণিত ধর্মের ভিত্তিতেই হয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহ এক বিবৃতিতে বলেন হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস পেলে সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। স্বাভাবিকভাবে তাঁর এই বিবৃতি সহজে হজমযোগ্য হওয়ার নয়। কিন্তু সত্যটা চরম বাস্তব। উত্তর প্রদেশের গৌতম নগরে ১২ লক্ষ মোট জনসংখ্যার মধ্যে

মুসলমান ৪২ শতাংশ, দলিত ২১ শতাংশ এবং বাকি অন্যরা। এলাকাটিতে মুসলমান জনসংখ্যার আধিপত্য হওয়ায় এখন তারা জায়গাটির নতুন নামকরণ করতে চাইছে 'ইসলাম নগর।'

শুধু তাই নয়, স্থানীয় নিরীহ দলিত সম্প্রদায়কে তারা ইসলাম গ্রহণের জন্যও প্রচুর চাপ দিচ্ছে। এর আগেও এরকম অনেক কিছু আমরা পশ্চিমবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদে আভাস পেয়েছি। তাহলে গিরিরাজ কি সত্যি কোনও ভুল ব্যাখ্যা করেছেন? ওয়েসি কি কাশ্মীরের ডেপুটি মুফতি আজম নাসির-উল-ইসলামের মুখ চেপে ধরতে পারবেন, যিনি কিছুদিন পূর্বেও বিবৃতি দিয়েছিলেন ১৭ কোটির মুসলমান পাকিস্তান বানাতে পারলে আমরা ২০ কোটির মুসলমান আলাদা দেশ কেন বানাতে পারবো না। খুবই দুঃখের, রাহুল গান্ধী নির্বাচনী প্রচারে মন্দিরে যান এবং টিকা লাগান হিন্দুভোট পাওয়ার জন্য। একজন পৈতেধারী ব্রাহ্মণের মন্দির যাওয়া নিয়ে কোনও বিতর্ক হওয়ার কথা নয়। আসলে তোষণের জন্য এসব করা হচ্ছে। সমাজের এইরূপ তোষণ নীতি শুধুমাত্র হিংসার বীজ বপন করছে।

—রঞ্জন কুমার দে,
সুকান্ত লেন, তারাপুর শিলচর।

মমতার নেতাজী বন্দনা

মমতা ব্যানার্জি সুযোগ পেলেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আঘাত করেন। সম্প্রতি নেতাজীর জন্মদিনে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন নেতাজীকে রাজনৈতিক মর্যাদা না দেওয়া নিয়ে। তিনি বা তৃণমূল কংগ্রেস যে দলের বংশধর অর্থাৎ কংগ্রেস, তার আদি গুরু গান্ধীবাবা নেতাজীকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। তার মানসপুত্র জওহরলাল ১৯৪৬-এর ডিসেম্বরে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী এটলিকে লেখেন—

Mr. clement Attle Prime Minister of Engeand. 10 Downing street, London.

Dear Mr. Attle

I understand from most reliable source that Subhas chandra Bose, your war criminal, has been allowed to enter Russian Territory by Mr. Stalin. This is a clear treachery and betrayal of faith by the Russians as Russia has been an alliy of British Americions, which she should Americions, which she should not have done. Please take note of it and do what you consider proper and fit.

yours seincerly.
Jawaharlal Nehru.

এই পত্রখানির কপি নেহরুর মৃত্যুর পর তার স্টেনোগ্রাফার খোলসা কমিশনের হাতে দেন। এই পত্রখানা থেকেই বোঝা যায় নেহরু কতখানি হীন এবং জঘন্য চরিত্রের লোক ছিলেন। এই ব্যাপারে মমতা ব্যানার্জি চুপ কেন? জানতে ইচ্ছা করে।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,
কলকাতা-৬৪।

শৌর্যবীর্য দিবস পালন

হিন্দু ব্যায়ামের আখড়া, ক্রীড়াসঙ্ঘ ও শক্তিপুঞ্জে কোন কোন ব্রত, পূজা ও উৎসব উৎযাপিত হবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা গেল। কেবল ষোড়শোপচারে পূজা আর হৈচৈ করেই যেন দিনগুলি না কাটে। বরং দিনগুলির প্রতীকী তাৎপর্য দেশের কিশোর ও তরুণ দলকে বিবৃত করে তাদের সংহত ও সন্নিবিষ্ট করা জরুরি। শরীরচর্চার পাশাপাশি তাদের মানসিক বিকাশ সাধিত হোক। পেশীর সৌষ্ঠবই হয়ে উঠুক সৌন্দর্যবর্ধনের অন্যতম মাপকাঠি। আখড়া সঙ্ঘ ও শক্তিপুঞ্জের কিশোর ও তরুণরা সব ধরনের খেলাধুলায় পারদর্শী হয়ে উঠুক; তাদের ইস্পাতের মতো পেশীশক্তি হোক। গাছে চড়া, সাঁতার কাটা, গাড়ি চালানো, লাঠিখেলা, কুস্তি, ক্যারাটে এবং প্রয়োজনে অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ জরুরি। সনাতন আদর্শে রচিত দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ হবার জন্য দিনগুলি হয়ে উঠুক শপথ দিবস। সর্বোপরি তারা চরিত্রবান হোক। সমাজের যে যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছেন অনুগ্রহ করে এই কিশোর ও তরুণদলকে সাধ্যমত উৎসাহ দিন।

শৌর্যবীর্য দিবসের তালিকা :

১. **মহাবীর পূজা :** শ্রাবণের শুক্লা পঞ্চমীতে সৈনিক শিরোমণি ও শক্তি-ভক্তির সমন্বিত আধার শ্রী হনুমানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তাঁর বীর্যবত্তা, সমরকৌশল ও প্রভুভক্তির উপাসনা।

২. **জন্মাষ্টমী :** ভাদ্রের কৃষ্ণা অষ্টমীতে যোদ্ধৃবেশী অবতার কৃষ্ণের স্মরণ ও শোভাযাত্রা।

৩. **অস্ত্র-পূজন তথা বিজয়াদশমী :** আশ্বিন শুক্লা দশমীতে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির জয় আনার লক্ষ্যে মগজাস্ত্রে শান দেবার দিন।

৪. **কার্তিক ব্রত :** কার্তিক সংক্রান্তিতে জাতীয় প্রতিরক্ষা ও বীর্য সঞ্চারকারী দেবতা তথা দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র উপাসনা করে আত্মোৎসর্গের বীর্যদীপ্ত প্রেরণা লাভ।

৫. **ভীষ্মাষ্টমী :** মাঘের শুক্লা অষ্টমীতে ভীষ্ম-তর্পণ করে বীরত্ব লাভের আশীর্বাদ ও সম্বৎসরের সঞ্চিত পাপের বিনষ্টি।

৬. **রামনবমী :** চৈত্রের শুক্লা নবমীতে যোদ্ধৃবেশী অবতার ও প্রজাপালক রামের উপাসনা ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ''This world is the great gymnasium where we come to make ourselves strong.'' বেদের প্রার্থনায় বলের উপাসনা, সামর্থ্যের পূজা আর শক্তি-আরাধনার কথা পাই, ''তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি। বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি। বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽস্যোজি ময়ি ধেহি।'' হে তেজস্বরূপ, আমায় তেজস্বী কর; হে বীর্যস্বরূপ, আমায় বীর্যবান কর; হে বলস্বরূপ, আমায় বলবান কর; হে ওজঃস্বরূপ, আমায় ওজস্বী কর।'' তাই ইচ্ছাশক্তির একত্র সম্মিলন ও এককেন্দ্রিকরণ হোক হিন্দু ব্যায়ামাগার, ক্রীড়াসঙ্ঘ ও শক্তিপুঞ্জে। তারা আত্মোপলব্ধি করে দেশকে নির্মাণ করুক।

—ড. কল্যাণ চক্রবর্তী,
কল্যাণী, নদীয়া।

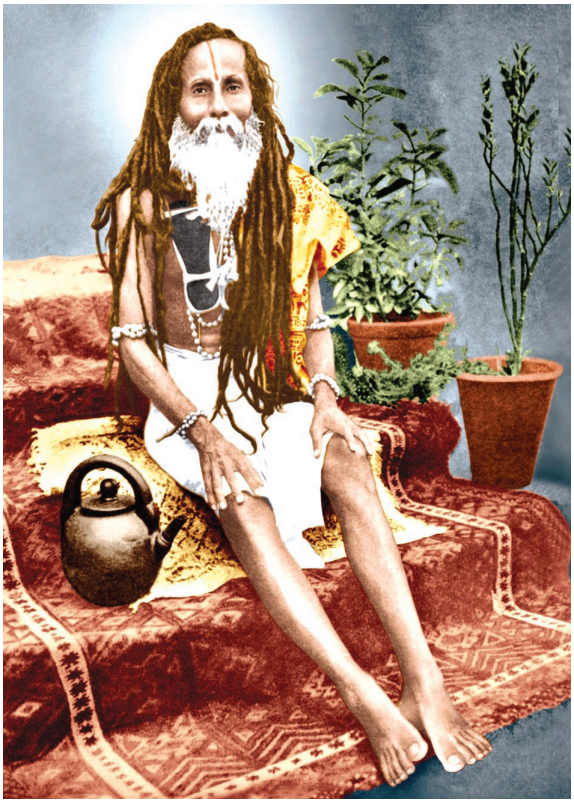

‘প্রভু নিত্য আছ জাগি’

সারদা সরকার

পুণ্যত্রিবেণীসঙ্গম। জাহ্নবী এখানে মুক্তবেণী নাম নিয়েছেন। সঙ্গে দুই সখী-যমুনা ও সরস্বতী। ত্রিধারায় তিন সখী কলরোলে উচ্ছলে একসঙ্গে বহমানা। তিন নদীর মিলনতীর্থপথে সাক্ষী হয়েছে বিভিন্ন ঘাট মন্দির গির্জা মসজিদ জনপদ। মহাকাল শুধু নীরবে বয়ে চলে— কত যে ইতিহাস লেখা রয়েছে তার সারা অঙ্গে। হিন্দুদের পরম তীর্থস্থান এই ত্রিবেণী গঙ্গার ঘাটের পাশেই রয়েছে মনসামঙ্গলে বর্ণিত চাঁদ সওদাগরের কাহিনীর নেতি ধোপানির পাটাতন। আজও হয়তো কলার ভেলায় ভেসে চলে বেহুলা তার মৃত স্বামীর দেহ কোলে নিয়ে। যারা সেই চোখ নিয়ে অপেক্ষা করে, তারা ঠিক দেখতে পায়। ত্রিবেণী গঙ্গার ঘাটেই রয়েছে বেণীমাধব মন্দির, প্রাচীন শিবমন্দির, কালীতলায় ডাকাতকালীর মন্দির, পাশেই বাঁশবেড়িয়ায় হংসেশ্বরী মন্দির, রয়েছে অনন্ত বাসুদেব মন্দির ও আরও অনেক দেব দেউল। এমনই এক মন্দিরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াই আমরা।

ধরে নেওয়া যাক এখন বাংলা ১৩১৯ সাল, ২৯ পৌষ। অর্থাৎ ইংরেজি ১৯১২। মকরসংক্রান্তি। কিন্তু এই বাড়িটিতে এসে দাঁড়ালে মনে হয় যেন সময় থমকে দাঁড়িয়ে গেছে এখানে। পৃথিবী সৃষ্টির সময় সেই যে অনন্ত ওঙ্কারধ্বনির শুরু, তা কান পাতলে এখনও শোনা যায় অ-উ-ম— ওম্। প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ শ্রী শ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ দীক্ষা নিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু দেব দাশরথি স্মৃতিভূষণের কাছে। যোগীশ্বর দাশরথি। ধ্যানমগ্ন গুরুশিষ্য। গুরু আশীর্বাদ করলেন দীর্ঘ অমানিশার রাত পেরিয়ে আঁধারের অবসান হোক। এই ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে আছে যে আলো, সেই আলো উদ্ভাসিত হোক। মায়ার জাল ছিন্ন করে আমরা যেন উত্তীর্ণ হতে পারি কালজয়ী, নাশহীন সত্যে। ওই সত্যই আমাদের আত্মা। বেদ বলছে, ভুবন জুড়ে চলছে পরিবর্তনের লীলা। সেই নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্যে অবিনশ্বর অবাঙ্মানসগোচর আত্মা একমাত্র পবিত্র পূর্ণাঙ্গ। আত্মাই ঈশ্বর। মনে রেখো আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে পূর্ণাঙ্গ ঐশ্বরিকতা, প্রকাশ কর সেই দেবত্বকে। জাগ্রত কর আত্মাকে, মনে রেখো আমরা অপাপবিদ্ধ। যেমন রাতের আঁধারে জ্বলে তারার আলো, তেমন আমাদের সকল দুখের মাঝে জ্বলছে তাঁর স্পর্শের আলো।

এদিকে সূর্য ধীরে ধীরে ঢলে পড়ছে যখন, আকাশে বিকেলের নরম আলো, পরমমুহূর্ত বুঝি একে বলে। এ এক অপূর্ব মহাজাগতিক যোগাযোগের সময়। ঢং করে ঘণ্টা বাজল দূরে মন্দিরে। গাঁয়ের বধূরা শাঁখে ফুঁ দিল বুঝি এক সঙ্গে। গুরু-শিষ্য ত্রিধারা গঙ্গার দিকে মুখ করে ধ্যানে বসলেন। ত্রিবেণী শহরের এই ছোট্ট বাড়ির টালির চালের এই ঘরটিতে ধ্যানের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছেন দুটি আত্মা এক অনন্ত মহাশূন্যে। গুরুর সঙ্গে শিষ্যের এক নিশ্চন্ত আধ্যাত্মিক বন্ধন সময়কে নিয়ে চলেছিল এক অন্য অসীমে। মন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত হলেন স্বয়ং যোগীবরিষ্ঠ, ত্যাগের মূর্ত প্রতীক।

শব্দব্রহ্ম ওঙ্কার হলেন শব্দের মূল! আ-কার অর্থে সৃষ্টি, উ-কার অর্থে স্থিতি আর ম-কার অর্থে প্রলয়— ইনি আত্মা ব্রহ্ম, নিশ্চল নিরাকার নির্গুণ সর্বশাস্ত্রের গুহ্যতত্ত্বস্বরূপ।

বহু বছর পরে আবার একদিন এই ঘরে ফিরে আসতে হয়েছিল সীতারামদাসকে, তখনও তিনি ওঙ্কারনাথ হননি। কিন্তু সাধনার সেই স্তরে তখন সব ওঙ্কারময় হয়ে গেছে তাঁর। ধ্যানযোগে নাম ভেসে এল ওঙ্কারনাথ। ঘট স্থাপন করে বটপত্রে নাম লিখলেন ওঙ্কারনাথ। শিবের প্রলয়নাচন নাচতে লাগল অক্ষরেরা। দুনিয়া দুলে উঠল এক আনন্দময় স্পন্দনে। ত্রিবেণীর গঙ্গার গেরুয়া ত্রিধারায় তখন সমুদ্রের গর্জন। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ তখন। ১৯৩৬ সাল। ধীরে ধীরে সব শান্ত হয়ে এল। ওঙ্কারময় এক নিরাভরণ ত্যাগী সাধক সেদিন জোড় হাতে প্রার্থনা করলেন— মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্ণ সন্ত্বোষধীঃ মধুনক্তমুতোষসঃ। মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধুদয়ৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমানস্তু সূর্যঃ মাধ্বীর্গাবোঃ ভবন্তু নঃ।

এমনই থাক চিরদিন। এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল। শিবময় হোক, শুভময় হোক। এই সার্থকতা পূর্ণত্বময় হোক। বাতাস, নদী, প্রতি পত্রপুষ্প, সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, ধরণী এবং প্রতিটি প্রাণীতে মধু সঞ্চারিত হোক।

পরে স্বামী ধ্রুবানন্দগিরি মহারাজ নতুন ডোর কৌপীন বহির্বাস

দিয়ে নাম দিলেন তাঁর। তিনি ধ্যানে পাওয়া নাম গুরুমুখী করে শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করলেন। আনুষ্ঠানিক ভাবে সংসার থেকে বিরত হলেন তিনি। ত্যাগধর্ম গ্রহণ করলেন। ওঙ্কারসিদ্ধ হলেন সীতারামদাস, তাই নাম হলো সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ।

এক বিধবা জননী সিদ্ধেশ্বরী দেবী এই বাড়িটি দিয়েছিলেন ওঙ্কারনাথের গুরুদেবকে। বাড়িটি সব সীতারাম পথিকদের কাছে তীর্থস্থান। কান পাতলে এই বাড়ির প্রতিটি দেওয়ালে হয়তো এখনও শোনা যায় মন্দ্রস্বরে গুরুশিষ্যের সমস্বরে ওঙ্কারধ্বনি।

গুরুপ্রপন্ন সীতারাম তাঁর গুরুভক্তির দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন আজীবন। ন গুরোরধিকং তত্ত্বম, ন গুরোরধিকং তপঃ, ন গুরোরধিকং জ্ঞানম, তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।

এমন শিষ্য যাঁর তাঁর আর চিন্তা কী? তাই দাশরথি দেবও নিশ্চিন্তে এই বাড়িটি দিয়ে গিয়েছিলেন সীতারামকে। নাম দিলেন দীক্ষাস্থলী। এখান থেকে সীতারামদাস হয়েছিলেন ওঙ্কারনাথ। ভারতীয় সংস্কৃতির মূলে রয়েছে ত্যাগ এবং ভালোবাসা, প্রেমের ঠাকুর সীতারামের এই বাড়ি থেকে শুরু হয়েছিল সেই যাত্রা।

'সর্বে ভবন্তুসুখিনঃ সর্বে সন্তুনিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগভবেৎ'।।

কিন্তু কালের কবল থেকে রক্ষা পায়নি গঙ্গাতীরের এই পবিত্র তীর্থস্থলীটি। যদিও বর্তমানে মঠটি অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের অধীনস্থ, তবু জরাজীর্ণ মঠটিতে টালির চালের দুটি ছোট ঘর প্রতি সন্ধ্যায় যখন নামমুখরিত হয়ে ওঠার কথা সেই সময় সে লড়ে অস্তিত্বের লড়াই।

শুধুমাত্র ২৯ পৌষে তবু কলকাতা থেকে কিছু ভক্ত হয়তো আসেন, নামগানে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সীতারামের ওঙ্কারময় মুখমণ্ডল। মাঝে মাঝে ভক্তরা বিফলমনোরথ হয়ে ফিরেও আসেন, দরজা খোলে না কেউ ভিতর থেকে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাব বড় নির্মম হয়ে ফুটে ওঠে। কষ্ট হয় ঠাকুরের, কষ্ট হয় পরমগুরুদেবের, তবু বাস্তব তো এটাই।

মহাযোগীর দীক্ষাস্থল যে বড় পবিত্র। লক্ষ লক্ষ ভক্তের পরম আশ্রয় এই বাড়িটি। ভক্তাধীনের ইচ্ছে হলে আবার জ্বলে উঠবে আলো, কোনও দানী মানুষের ইচ্ছে হলে হয়তো বা নতুন করে হবে সংস্কার কার্য। নামে নামে আকাশ ছেয়ে যাবে। প্রাণের ঠাকুর সীতারামের নামে জয়ধ্বনিতে ভরে উঠবে ত্রিবেণীর আকাশ বাতাস নদী। হয়তো বা নেতা ধোপানীর ঘাটের পাশ দিয়ে যাওয়া সতী বেহুলা থমকে দাঁড়াবে, এক মুহূর্তের জন্যে তার স্বামীর কানে কানে ছোঁয়াবে মহামন্ত্র নাম। কলিযুগে এই নামেই তো রয়েছে মুক্তি।

হরের্নামৈব হরের্নামৈব হরের্নামৈব কেবলম্— কলৌনাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা! নামাবতার শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের দীক্ষাস্থলী আবার নবরূপে সেজে উঠুক, ভক্তরা এগিয়ে আসুক— লক্ষ লক্ষ ভক্ত যাঁর, তাঁর স্মৃতিধন্য তীর্থক্ষেত্র কখনও অবহেলিত হতে পারে না।

আজও যে তিনি ভক্তের ডাকে সাড়া দেন, আজও তিনি সদাজাগ্রত জ্যোতির্ময় যোগীবর। তাঁর ভালোবাসার স্পর্শ আজও আমরা সর্বদা পাই প্রতিনিয়ত— শুধু একটি আকুল করা ডাকের অপেক্ষায় তিনি প্রহর গুনছেন যে! আসুন না, একবার ডাকি সকলে মিলে। ■

বেদের সারমর্ম

রবীন সেনগুপ্ত

বেদ শব্দের অর্থ হলো জ্ঞান। যার যতই ভক্তি স্মৃতি ও কর্মদক্ষতা থাকুক না কেন জ্ঞান না থাকলে কোনও কর্মই সুচারু ভাবে সম্পন্ন করা যায় না। যে-কোনও সৎ কর্মকেই ধর্ম বলে। আর যাবতীয় অসৎ কর্মকেই বলে অন্যায় বা পাপ। ধর্ম ও অধর্ম কথা দুটি কিছুটা আপেক্ষিকও বটে। একজনের কাছে যেটি পরম ধর্ম, অন্যজনের কাছে সেটি কুসংস্কার রূপেও গণ্য হতে পারে। তবুও ওরই মধ্যে মানুষ তার বিচার বিবেচনা অনুযায়ী ধর্ম পালন করার প্রচেষ্টা করবে। ধর্ম প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। যথা জাগতিক ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ধর্ম। আহার, নিদ্রা, মৈথুন, রাজনীতি, খেলাধুলা, বিবাহ ও সংসার করা, অর্থ উপার্জন— এগুলি হলো জাগতিক ধর্ম। এই জাগতিক ধর্মগুলি পালন করতে গিয়ে মানুষ যখন ব্যর্থ, হতাশ ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখনই সে আধ্যাত্ম্য ধর্মের সাহায্য নেয়। কেউ কেউ জন্মগত ও পারিবারিক আগ্রহ বশত আধ্যাত্মিক মার্গে রত হয়।

ধ্যান জপ পূজা, ধর্ম গ্রন্থ পাঠ, তীর্থ ভ্রমণ, দীক্ষা গ্রহণ, ব্রহ্মচর্য পালন, আশ্রম বাস, শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ— এগুলি হলো আধ্যাত্মিক ধর্ম। বিপদের সময়ে যারা এই সকল আধ্যাত্মিক ধর্মের আশ্রয় নেয় না— তারা মদ ড্রাগ বা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। কাজেই জাগতিক ও আধ্যাত্মিক দুই প্রকার ধর্মেরই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ঈশ্বর এক এবং তিনি হলেন সৃষ্টি ধ্বংসহীন নিরাকার এক মহাশক্তি তরঙ্গ। কিন্তু দেবদেবীর সংখ্যা বহু। এই সকল দেবদেবীকে মাধ্যম করে নিরাকার ঈশ্বরের সাধনা করলে তা ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। আবার কারও ক্ষমতা থাকলে সরাসরি নিরাকার ঈশ্বরের সাধনাও করতে পারে।

দেবদেবীদের মধ্যে যারা খুব ক্ষমতাশালী, তাঁদের ঈশ্বর কোটির দেবদেবী বা ভগবান নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ, শিব, ব্রহ্মা, দুর্গা, কালী--- এনারা সকলেই ভগবৎ বা ব্রহ্মকোটির দেবদেবী। সমস্ত দেবদেবী, সাধক, অবতারেরই সীমাবদ্ধতা ও দোষ ত্রুটি রয়েছে। তবুও এনাদের আদর্শ ছাড়া সমাজ গঠন সম্ভব নয়।

ত্যাগ ভোগ ও মাঝারি মানের জীবনযাত্রা— এই তিনটিই ধর্মসম্মত। সবাই ত্যাগ করলে সমাজ চলবে কী করে। তাই মাত্রা বজায় রেখে ভোগ করার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। অর্থের সাধনা লক্ষ্মীর সাধনা। শুধুমাত্র সাধন সিদ্ধির সময় অর্থ ও কামকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। সিদ্ধি লাভের পর সাবধানে ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ— এই চতুর্বর্গের যথাযথ ব্যবহারে জীবন মধুর হয়ে ওঠে। সুস্থ ভাবে কলাবিদ্যার সাধনা করাও ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। ■

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

অগাস্ট উইলহেলম ভন শ্লেজেল : (১৭৬৭-১৮৪৫)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন জার্মানির শ্রেষ্ঠ গবেষক, সাহিত্য সমালোচক, কবি ও দার্শনিক। তিনিই প্রথম জার্মানির বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক হয়েছিলেন। তিনি ভগবৎ গীতার ল্যাটিন অনুবাদ করেন ১৮২৩ সালে আর রামায়ণের অনুবাদ সম্পন্ন করেন১৮২৯ সালে।

উদ্ধৃতি : বেদান্তের তুলনায় ইউরোপের সর্বোত্তম দর্শনশাস্ত্র যেন মনে হয় এক নিস্তেজ স্ফুলিঙ্গ।

উৎস : ইজ ইন্ডিয়া সিভিলাইজড? এসেস্ অন ইন্ডিয়ান কালচার— স্যার জন উড্রফ।

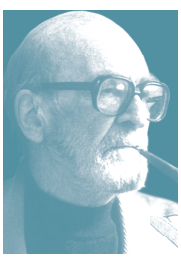

মিরসিয়া ইলেড : (১৯০৭-১৯৮৬)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন বিখ্যাত রোমান দার্শনিক, সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচক। সংস্কৃতের শিক্ষা তাঁর প্রগাঢ় প্রজ্ঞাকে মহিমান্বিত করেছিল। তিনি পাঁচ খণ্ডে এক বৃহৎ পুস্তকের রচনা সম্পন্ন করেন, 'হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান ফিলোসফি'।

উদ্ধৃতি : যোগ এমনই এক 'বিজ্ঞান' যার দ্বারা সসীম মানুষ অসীম মানুষে রূপান্তরিত হতে পারে। এটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, অন্তর্নিহিত ভাবে এই যোগবিজ্ঞান ভারতের অথবা ভারতীয় প্রজ্ঞার এক বিশেষ ধারা।

উৎস : যোগা— ইম্মরটালিটি অ্যান্ড ফ্রিডম। লেখক মিরসিয়া ইলেড।

উদ্ধৃতি : ভারতের যোগবিজ্ঞান মানব জীবনের বিভিন্ন অবস্থার অনুসন্ধান এত সূক্ষ্ম এবং গভীরভাবে করেছে যে অন্য কোথাও এর তুলনা পাওয়া ভার।

উৎস : যোগা— ইম্মরটালিটি অ্যান্ড ফ্রিডম। লেখক মিরসিয়া ইলেড।

স্যার উইলিয়াম জোনস্ : (১৭৪৬-১৭৯৪)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন বিখ্যাত ব্রিটিশ গবেষক, ভাষাবিদ, আইনজ্ঞ এবং অনেক পুস্তকের রচয়িতা। পাশ্চাত্য দেশে ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ইনিই প্রথম করান। সংস্কৃত নাট্য 'শকুন্তলার' ইংরেজি অনুবাদ (১৭৮৯) পড়ে পাশ্চাত্যের বহু পণ্ডিত যেমন জোহান গ্যেটে, গট্ফ্রিড হার্ডার, ফ্রেডেরিক শিলার প্রমুখ অত্যন্ত উল্লসিত, মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে যান। তিনি সংস্কৃত 'গীতগোবিন্দম্' (১৭৮৯), 'মনুসংহিতা' (১৭৯৪) এবং 'ঋতুসম্ভার'-এর ভাষান্তরের কাজও সম্পন্ন করেন।

উদ্ধৃতি : ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে উল্লেখিত ষড়দর্শনের কথা পাওয়া যায় ওল্ড অ্যাকাডেমি, স্টোয়া, লাইসিয়ামে বর্ণিত অধ্যাত্মবিদ্যায়। এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব হবে যে, বেদান্ত দর্শন বা তাতে বর্ণিত বহু দৃষ্টান্তের বিশদ ব্যাখ্যা না পড়ে পিথাগোরাস এবং প্লেটো তাঁদের মহান দর্শনশাস্ত্রের রচনা সম্পন্ন করেছিলেন। এটা নিশ্চিত ভারতের প্রাচীন মহান ঋষিদের রচিত ধর্মশাস্ত্রই ছিল গ্রিক সাহিত্যের উৎপত্তির মূলস্রোত।

উৎস : দ্য ফিলোম্যাথিক জার্নাল—ফিলোম্যাথিক ইন্সটিটিউসন।

সাভেরাস সেবো : পরিচিতি : ইনি ছিলেন সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ সময়ের আধুনিক সিরিয়ার অধিবাসী অন্যতম বিখ্যাত বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও পরিব্রাজক ধর্মগুরু। তিনিই প্রথম ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে আসেন পাশ্চাত্য দেশে।

উদ্ধৃতি : আমি হিন্দুদের প্রজ্ঞার কথাই শুধু বলব না... তাদের ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর সূক্ষ্ম গবেষণা ও অনুসন্ধান। তাদের গণিতশাস্ত্রের দক্ষতা এবং অসাধারণ গণনা পদ্ধতি ছিল গ্রিক এবং ব্যাবিলনীয়দের থেকেও অনেক বেশি প্রতিভাশালী। আমি উপযুক্ত শব্দের অভাব বোধ করছি তাদের অসামান্য প্রতিভার কথা বলতে গিয়ে, বিশেষ করে তাদের ন'টি গাণিতিক সাংকেতিক অঙ্ক চিহ্নের আবিষ্কার বিষয়ে।

উৎস : দ্য ওয়ান্ডার দ্যাট ওয়াস্ ইন্ডিয়া— এ. এল.ব্যাসাম।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

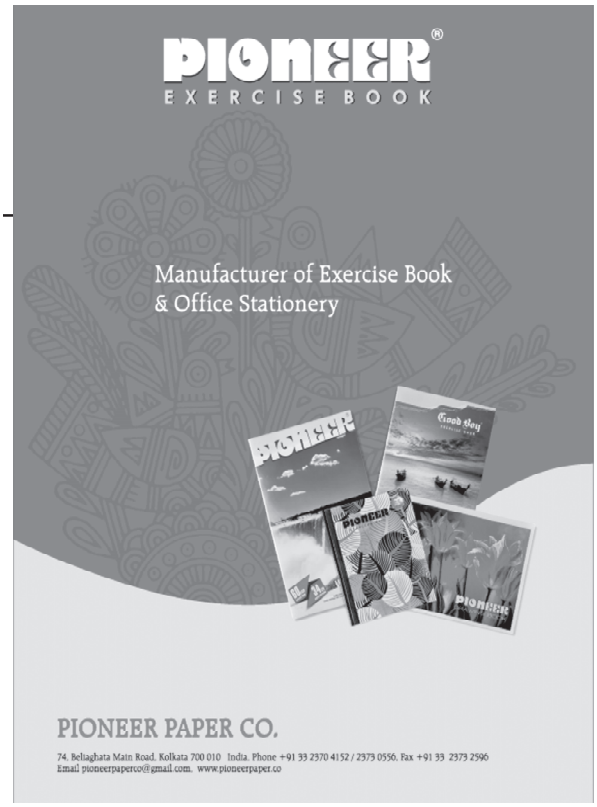

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

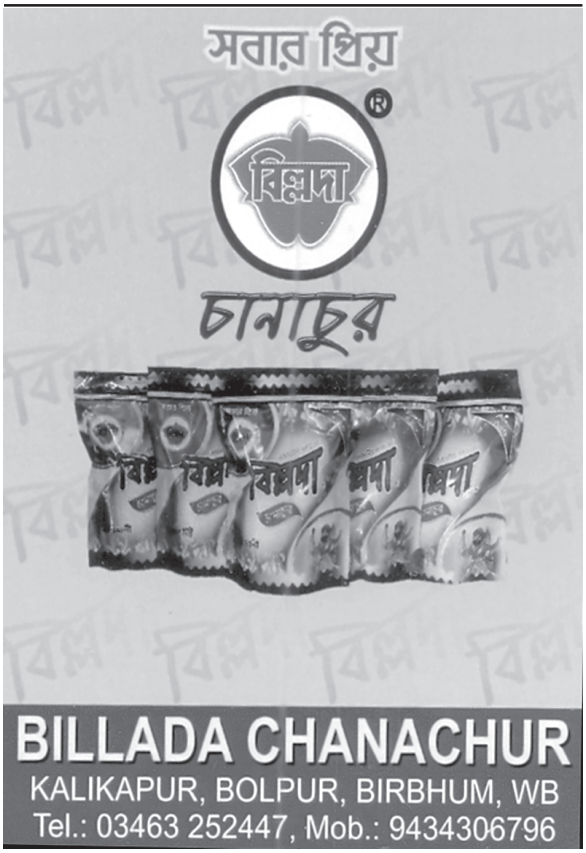

ফাল্গুনমাসের কৃষিকর্ম

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

বোরোধান : যে বোরোধান মাঘ মাসের প্রথম পক্ষ পর্যন্ত রোয়া চলেছিল তাতে ফাল্গুনের শুরুতেই প্রথম চাপান সার (রোয়ার তিন সপ্তাহ পর) দিতে হবে; ফাল্গুনের শেষে দিতে হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের চাপান সার (রোয়ার ৬ সপ্তাহ পর)।

প্রতিবারই চাপান প্রয়োগের আগে হাত নিড়ানি বা বিদা (Paddy weeder) দিয়ে জমির আগাছা দূর করতে হবে। প্রয়োজনে দ্বিতীয় নিড়ানির সময় জমিতে ছিপছিপে জল ধরে রেখে আগাছানাশক রূপে বিঘা প্রতি ২৫০ মিলি বিপাইরিভ্যাক সোডিয়াম ৭০ লিটার জলে গুলে জমির আগাছায় স্প্রে করা যেতে পারে।

প্রথম চাপান হিসেবে বিঘা প্রতি নাইট্রোজেন সার লাগবে উচ্চ ফলনশীল ধানের জন্য ২০-২৪ কেজি আর সংকর ধানে ২৪-৩০ কেজি; পটাশ লাগবে যথাক্রমে ১০-১২ এবং ১২-১৫ কেজি। দ্বিতীয় চাপান রূপে কেবলমাত্র নাইট্রোজেন দিতে হয়। তা উচ্চ ফলনশীল এবং সংকর জাতের জন্য যথাক্রমে ১০-১২ এবং ১২-১৫ কেজি। চাপান সার দেবার আগে জমি থেকে জল বের করে দিতে হবে।

রোরোধানে এ সময় চারার বয়স অনুযায়ী মাজরাপোকা এবং বাদামি শোষক পোকা হানা দিতে পারে। দেখা দিতে পারে ঝলসা রোগ, খোলাপচা রোগ এবং বাদামি দাগ রোগ। কৃষককে তাই জমিতে নিয়মিত পরিদর্শন করার সুপারিশ করা হচ্ছে। সমন্বিত কীটশত্রু দমন ব্যবস্থা (Integrated Pest Management) গ্রহণ করলে কীটনাশকের অনাবশ্যক ব্যবহার কমবে।

৫ শতাংশের বেশি মরাডিগ (dead heart) দেখা গেলে মাজরাপোকার জন্য দমন ব্যবস্থা নিতে হবে (বিঘা প্রতি সাড়ে তিন কেজি কার্বোফিউরান ৩জি দানা কিংবা লিটার প্রতি জলে ১ মিলি মনোক্রটোফস ৩৬ শতাংশ কিংবা ১.৫ মিলি ফিপ্রোনিল ৩ শতাংশ মিশিয়ে সিঞ্চন করতে হবে)। ঝাড় প্রতি ১০টি পোকা দেখলে তবেই বাদামি শোষক পোকার জন্য ব্যবস্থা নিতে হয়। এজন্য প্রতি ১০ লিটার জলে ৩ মিলি ইমিডাক্লোপ্রিড মিশিয়ে স্প্রে করা দরকার। রোগের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ পাশকাঠি কাবু হলে তবেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ঝলসা রোগ ও বাদামি দাগ রোগ ঠেকাতে বিঘা প্রতি ৮০ লিটার জলে ৮০ মিলিলিটার এডিফেনফস মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। খোলাপচা রোগে লিটার প্রতি ০.৭৫ মিলি প্রোপিকোনাজল অথবা ০.৫ গ্রাম ট্রাইসাইক্লোজল অথবা ২ মিলিলিটার ভ্যালিডামাইসিন মিশিয়ে সিঞ্চন করা জরুরি।

গম : সঠিক বোনা গমে ফাল্গুনমাসে পঞ্চম (দানায় দুধ আসার সময়, বোনার তিন মাস পর) ও ষষ্ঠ দফায় (দানা পুষ্ট হবার সময়, বোনার সাড়ে তিন মাস পর) সেচ দিতে হয়। নাবিতে বোনা গমে এ মাসে চতুর্থ দফায় এবং অধিক নাবিতে বোনা গমে তৃতীয় ও চতুর্থ দফায় সেচ দিতে হবে। তৃতীয় ও চতুর্থ দফা বলতে যথাক্রমে থোড় আসা (বোনার দু'মাস পর) ও ফুল আসা দশা (বোনার আড়াই মাস পর) বুঝতে হবে। এর মধ্যে চতুর্থ সেচ অর্থাৎ ফুল আসা-কালীন সেচটি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং তারপর ষষ্ঠ সেচ অর্থাৎ দানার পুষ্টিকালীন সেচটির গুরুত্ব রয়েছে।

আলু : নাবির আলুর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দফায় ভেলি তোলা না হয়ে থাকলে ফাল্গুনের প্রথমেই গোড়ায় মাটি তুলে দিন। তার আগে দমন করুন জমির আগাছা। রোগ-পোকা দমনের জন্য ব্যবস্থা নিন (মাঘ মাসের কৃষিকর্ম দ্রষ্টব্য)।

সঠিক সময়ে লাগানো আলু তোলবার সপ্তাহ দু'য়েক আগে আলুর কাণ্ডসহ উপরিভাগের বিটপীয় অংশ কেটে ফেলুন। এতে আলুর খোসা শক্ত হবে। সম্ভব হলে তামাঘটিত একটি ছত্রাকনাশক স্প্রে করুন, তাতে আলুতে চয়নোত্তর রোগের সমস্যা কমবে এবং গুদামে আলু দীর্ঘদিন ভালো থাকবে।

চীনাবাদাম : বসন্তকালীন চীনাবাদাম ফাল্গুনের প্রথম পক্ষ পর্যন্ত বোনা যাবে। প্রাক-খরিফ বা গ্রীষ্মকালীন চীনাবাদাম ফাল্গুনের মাঝামাঝি থেকে বোনা শুরু হয়ে চৈত্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত বোনা চলবে। বোনার পদ্ধতি জানতে মাঘ মাসের কৃষিকর্ম অনুসরণ করুন। বীজ বোনার ঠিক পরেই লিটার প্রতি জলে ১ গ্রাম পেন্ডিমিথালিন ২০ ইসি স্প্রে করলে আগাছা বহুলাংশে দমিত হয়।

বীজ বোনার প্রায় মাস খানেক বাদে এবং ফুল আসার মধ্যে হেক্টর প্রতি (৭.৫ বিঘায় ১ হেক্টর) ৪০০ কেজি জিপসাম মাটিতে দিলে বাদামে তেলের পরিমাণ বাড়ে এবং দানা পুষ্টিতেও সহায়তা করে। জিপসামের সালফার ও ক্যালসিয়াম এ কাজে মুখ্য ভূমিকা নেয়। ফুল আসার পরে মাটিতে অনুখাদ্য সোহাগা বা বোরাক্স (হেক্টরে ৬-৮ কেজি) প্রয়োগ করলেও সুফল মেলে।

মাঘের মাঝামাঝি বোনা বাদামে ফাল্গুনের প্রথমেই নিড়ান দিতে হবে। দ্বিতীয় নিড়ান লাগবে ফুল আসার সময়। মাঘের দ্বিতীয় সপ্তাহে বীজ বোনা হয়ে থাকলে ফাল্গুনের মধ্যেই দ্বিতীয় নিড়ান দেবার সময় হলো কিনা খেয়াল রাখুন। মনে রাখবেন চীনাবাদামের ফলন অনেকাংশে নির্ভর করে

তার পরিচর্যার উপর।

রবি পেঁয়াজ : ফাল্গুনমাসে জমিতে চাপান সার প্রয়োগ করতে হবে (কন্দ লাগানোর দেড় মাস পর; কন্দ লাগাতে হয় পৌষ থেকে মাঘ মাসের মাঝামাঝি সময়)। দু'মাসের মধ্যে চাপান দিতে না পারলে পেঁয়াজের গলা মোটা হয়ে যায়, কন্দ শুকোতে দেরি হয় এবং দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবার সম্ভাবনা তৈরি হয়। চাপান সার হিসাবে বিঘা প্রতি ১৫-১৭ কেজি নাইট্রোজেন এবং ১৩-১৫ কেজি পটাশ দিতে হবে।

পেঁয়াজ লাগানোর দেড়-দু'মাস পর হাল্কা নিড়ানি দিয়ে আগাছা তুলে ফেলতে হবে। সেচ ব্যবস্থা সুচারু হওয়া দরকার। ঘন সেচ দিলেও যেমন পেঁয়াজ উঠতে দেরি হয়, আবার দীর্ঘ সময় সেচ না দিয়ে হঠাৎ বেশি সেচ দিলেও পেঁয়াজ ফেটে যায়।

পেঁয়াজ চাষে এ সময় পাতার দাগ, ধ্বসা রোগ, ভূষা রোগ এবং চিরুনি পোকা বা থ্রিপসের আক্রমণ দেখা যায়। পাতা-দাগী রোগে পাতা-কাণ্ড-কন্দ ও কলিতে সাদা ছোট্ট ক্ষত সৃষ্টি হয়, তার মাঝে থাকে বেগুনি ফোঁড়া। ভূষা রোগে পাতার গোড়ায় লম্বাটে, গাঢ়, পুরু অংশ দেখা যায়। তামাঘটিত ছত্রাকনাশক যেমন ০.৪ শতাংশ ব্লাইটক্স অথবা ০.১ শতাংশ কার্বেন্ডাজিম ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যাবে। ভূষা রোগ দমনের জন্য বীজ শোধনই ভাল উপায়। চিরুনি পোকা পাতা ও কলির রস চুষে খায় এবং তাকে সাদা-ফ্যাকাসে করে দেয়। এই পোকা দমন করতে বিঘা প্রতি সাড়ে তিন কেজি ফ্যুরাডন বা দেড় কেজি ফোরেট দানা প্রয়োজনমতো এক পক্ষ অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।

নারকেল : এই মাস থেকে শুরু করে বৈশাখ মাস, এমনকী জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত নারকেলের বীজ সংগ্রহ করা যাবে। বাছতে হবে এক বছরের ঝুনো নারকেল; নিয়মিত, মাঝারি গোলাকার; ওজন প্রায় সোওয়া কেজি; ছোবড়া ছাড়িয়ে ওজন ছ'শ গ্রাম এবং কোপরার ওজন যেন দেড়শো গ্রাম হয়। নারকেল পাড়তে হবে যত্ন নিয়ে; কাঁদির উপর ও নীচের নারকেল বাদ দিলেই ভালো। পাড়ার পর প্রায় দেড়মাস এর সুপ্তি দশা। তারপর জল রয়েছে এমন নারকেল বীজ হিসাবে বেছে নিতে হবে।

আম : মাঘ মাস থেকেই জাতভেদে শুরু হয়ে যায় আমের গুটি ধরার সরষে-দশা। অতঃপর জাতভেদে মটর দানা, মার্বেল দশা দেখা যায় ফাল্গুনমাস জুড়ে। এই অবস্থায় আমগাছের ফসল সুরক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি। এই সময় আমের মূল কীটশত্রু হচ্ছে শোষক পোকা বা ম্যাঙ্গো হপার এবং মূল রোগ হচ্ছে সাদা গুড়োচিতি রোগ বা পাউডারি মিলডিউ, মুকুলের ঝলসা বা ব্লজম-ব্লাইট এবং ক্ষতরোগ বা অ্যানথ্রাকনোজ।

শোষক পোকা দমন করতে গেলে মুকুল বেরনোর সময়, মুকুল ফুটে যাওয়ার পর এবং গুটি ধরে গেলে— এই তিনটি পর্যায়ে কার্বারিল ৫০ শতাংশ প্রতি লিটার জলে ২.৫ গ্রাম অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ শতাংশ পোয়া মিলিলিটার (প্রতি চার লিটার জলে ১ মিলি) গুলে স্প্রে করতে হবে।

গুড়োচিতি রোগ দমন করতে হলে সালফার ঘটিত ছত্রাকনাশক যেমন সালফেক্স ৮০ শতাংশ পাউডার ২.৫ গ্রাম কিংবা কার্বেন্ডাজিম ৫০ শতাংশ পাউডার ১ গ্রাম কিংবা হেক্সাকোনাজোল ৫ শতাংশ ০.৫ মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে গুলে ছেটাতে হবে।

ঝলসা রোগ দমন করতে হলে কার্বেন্ডাজিম + ম্যানকোজেব মিশ্রণ যেমন সাফ প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম অথবা থায়োফেনেট মিথাইল যেমন রোকো ১ গ্রাম অথবা ক্লোরোথ্যালোনিল যেমন কবচ ২ গ্রাম অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড যেমন ব্লাইটক্স ৫০ শতাংশ পাউডার ৩ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ক্ষতরোগ দমন করতে মুকুল দশায় ফুল ফোটার আগে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে মটরদানার মতো গুটিতে কার্বেন্ডাজিম + ম্যানকোজেব মিশ্রণ ২ গ্রাম অথবা থায়োফেনেট মিথাইল ১ গ্রাম অথবা হেক্সাকোনাজল ০.৭৫ মিলিলিটার হারে প্রতি লিটার জলে আঠার সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

গোখাদ্য ভুট্টা : উপকূলীয় লবণাক্ত মৃত্তিকা অঞ্চলে ফাল্গুনমাস থেকে বীজ বোনা শুরু করা হয়। বিঘায় ৬-৮ কেজি বীজ লাগবে; গাছের দূরত্ব হবে ২৫-৩০×১০-১৫ সেমি। বিঘাতে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সার দিতে হবে যথাক্রমে ১৩, ৮ এবং ৪ কেজি। বোনার দেড় থেকে দু' মাসের মধ্যে সবুজ গোখাদ্য কেটে নিতে হবে।

তিল : ফাল্গুনমাসে তিলের বীজ বোনা শুরু করতে হবে। তিলের উন্নত জাত হচ্ছে তিলোত্তমা, রমা, কৃষ্ণা, প্রতাপ, গৌরী, সাবিত্রী, বি-৯, বি-১৪ ইত্যাদি। বিঘা প্রতি ১ কেজি বীজ লাগবে।

জমি তৈরির সময় বিঘা প্রতি ১০ কুইন্টাল জৈবসার প্রয়োগ করার কথা বলা হচ্ছে, সঙ্গে দু' কেজি জীবাণু সার অ্যাজোটোব্যাক্টর + পিএসবি মিশ্রণ এবং মূল রাসায়নিক সার হিসাবে চার কেজি করে নাইট্রোজেন ও ফসফেট এবং দু' কেজি পটাশ। বীজ বোনার ১৫-২০ দিন পর প্রতি বর্গ মিটারে ৩০-৪০টি চারা রেখে বাকিগুলি তুলে গাছের সঠিক ঘনত্ব বজায় রাখতে হবে। আগাছা দমনের পর হাল্কা করে একটি সেচ দেওয়া দরকার।

হলুদ : হলুদ গাছ সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে সাবধানে তুলতে হবে। হলুদ তুলে তা পরিষ্কার করে ছায়ায় শুকিয়ে নিতে হবে। হলুদের ফলন বিঘা প্রতি প্রায় আড়াই টন হওয়া উচিত।

কলা : সেচের সুবিধা থাকলে ফাল্গুনমাসে চারা লাগানোর আদর্শ সময়। টিস্যু-কালচার চারা ব্যবহার করলে দশ শতাংশ অতিরিক্ত ফলন পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের জন্য ক্যাভেন্ডিস গ্রুপের বেঁটে জাত যেমন রোবাস্টা, জায়েন্ট গভর্নর, কাবুলি; মাঝারি বা সিল্ক জাত যেমন মর্তমান, মালভোগ, চাঁপা; লম্বা জাত যেমন কাঁঠালি, আঁঠিয়া, মনোয়া এবং কাঁচকলা যেমন বাইশ ছড়া, বেহুলা, গ্রিন বোম্বাই ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য জাত। ■

স্বাস্থ্যরক্ষায় কিছু বিধান

সত্যানন্দ গুহ

১। ভাত খাওয়ার পূর্বে হাত পা ধুয়ে বসা ভালো। মাথার রক্ত নিচে নেমে আসে, হজমের সহায়ক হয়।

২। মাঝে মাঝে চোখে, মুখে, ঘাড়ে, নাভিকুণ্ডে জলের ধারা ঝাপ্‌টা দেওয়া ভাল।

৩। সময় পেলেই পেটের ওপর ভিজাপটি দেওয়া ভাল। বিশেষত খাওয়া-দাওয়ার পর।

৪। সপ্তাহে একদিন পেটের চারপাশে ঠাণ্ডা নরম মাটির (কাদা করে) প্রলেপ দেওয়া ভাল।

৫। ভিজাপটি।

৬। সকালে খালিপেটে লেবুজল (নুন চিনি বাদ), দুপুরে কাঁচা আলু (খোসা সমেত) বা শশা (খোসা সমেত) স্যালাড খেতে হবে।

৭। কোনও টক দ্রব্য ভাত, রুটি বা অন্য কোনও খাবারের সঙ্গে খাওয়া চলবে না।

৮। কোনও খাবার খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জল খাওয়া চলবে।

৯। খালি পেটে প্রচুর জল পান করতে হবে।

১০। খাদ্যের ৭০ শতাংশ ক্ষারধর্মী খাবার হবে।

১১। রোগ-শোক-দুঃখ-উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা, টেনশান থেকে যত সম্ভব দূরে থাকতে হবে। আনন্দময় পরিবেশে থাকতে হবে।

১২। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার জন্য সদা সচেষ্ট থাকতে হবে, পায়খানার গণ্ডগোল মানেই শরীরের যত ব্যাধির জন্ম।

১৩। নিমের দাঁতন, দাঁতে তেল লবণ লাগানো এবং প্রতিদিনে দু'বার খাওয়ার পরে (অন্তত রাতে শোয়ার আগে ফিটকিরি জলে গুলে কুলকুচি করা ভাল। দাঁত ভাল থাকলেই পেট ভাল থাকে, আর পেট ভাল থাকলে শরীরও ভাল থাকে।

১৪। নিয়মিত প্রাতর্ভ্রমণ, বায়ুস্নান, সূর্যস্নান, বিভিন্ন মুদ্রা সাধ্য মতো করা

ভাল।

১৫। নিয়ম করে প্রতিদিন ১৫-২০ মিনিট ধ্যান করা উচিত। এতে মানসিক বিশ্রাম হয়, মস্তিষ্ক শান্ত হয়।

১৬। তামার হাঁড়ি, মাটির হাঁড়ি বা কুঁজোতে জল রেখে খাওয়া ভাল।

১৭। খাওয়ার পর এক টুকরো হরতুকি মুখে রেখে চুষে খাওয়া ভাল।

১৮। পায়খানা প্রস্রাবের বেগ চেপে রাখা উচিত নয়, সামান্য সময় রাখলেও রক্ত দূষিত হয়, বায়ু কুপিত হয়।

১৯। সকালের টিফিনের সঙ্গে ভিজা ছোলা, ভিজানো বাদাম, ভিজানো মুগ খাওয়া ভাল। কিছুক্ষণ পর (২৫ মিনিট) ওই সব ভেজানো জল পান করলে পিত্ত ঠাণ্ডা থাকে।

২০। মাঝে মাঝে পুরনো তেঁতুল (৪/৫ বছর বা বেশি) রাতে ভিজিয়ে সকালে আখের গুড়সহ খেলে পাকস্থলী ধৌত হয়।

২১। শাস্ত্রমতে : মুনিরা (সাত্ত্বিক ব্যক্তি) খাবেন ৮ গ্রাম, অরণ্যবাসী ১৬ গ্রাম ও গৃহস্থ ৩২ গ্রাম খাদ্য গ্রহণ করবে।

২২। পেটের ২ ভাগ সুস্নিগ্ধ মধুর অন্ন, একভাগ বিশুদ্ধ জল ও অপর ভাগ বায়ু সঞ্চালনের জন্য খালি থাকবে।

২৩। একবার রান্না করা খাদ্য দ্বিতীয়বার গরম করে খাবে না। (শরীরে কফ জন্মায় ও রুক্ষ হয়)।

২৪। দিব্য উদক বা বিশুদ্ধ জল হলো বৃষ্টির জল, গঙ্গাজল, ঝরনার জল পান করতে হবে (অন্য জলে বায়ু দুষ্ট হতে পারে)।

২৫। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ২০-২৫ মিনিট বিশ্রাম, রাতের আহারের পর ১০-১৫ মিনিট হাঁটা উত্তম।

২৬। স্বামী প্রণবানন্দের বাণী— সংযমই মানুষকে নীরোগ ও শতায়ু করে।

২৭। ভাত/রুটি খাওয়ার পর একটি পানের পাতা/পাথরকুচি পাতা/ একটি কাঁচা আলু/এক মুঠো চাল...যে কোনও একটি চিবিয়ে খেলে ভাল হজম হয়। বায়ু, অম্ল, বদহজম হয় না।

২৮। পায়খানা প্রস্রাব করার সময় চোখ বুঁজে দাঁতে দাঁত চেপে রাখতে হয়। দাড়ি ফেলার সময় রেজার বা ব্লেড উপর থেকে নিচের দিকে বেশি জোর দিয়ে না চাপাই ভাল। অন্যথায় দাঁত-চোখ খারাপ হতে পারে। *(লেখক প্রাকৃতিক চিকিৎসক)*

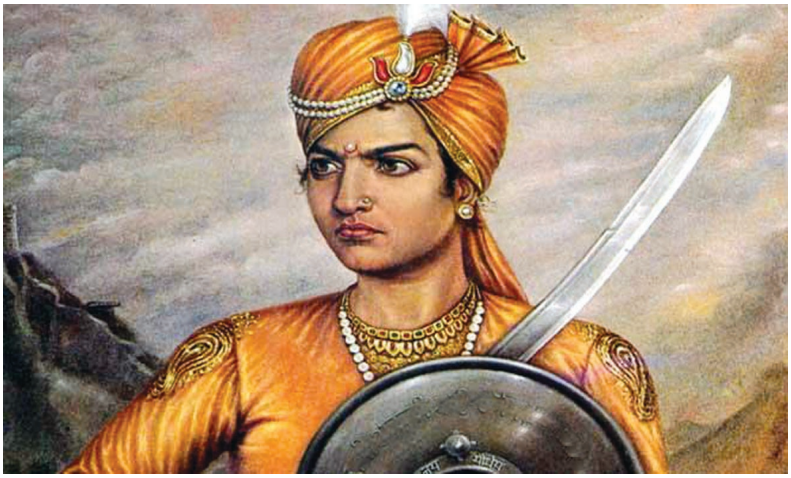

অন্য রকম

রামগড়ের বিস্মৃত রানি অবন্তীবাই

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নীরদ সি চৌধুরী বাঙালিকে বলেছিলেন আত্মবিস্মৃত জাতি। নিজের ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালির অনুসন্ধিৎসা নেই। আয়ুষ্কাল নামক একটি নির্দিষ্ট কালখণ্ডের মধ্যে বাঙালি বেঁচে থাকে, তারপর টুপ করে একদিন মরে যায়। কথাটা যে বহুলাংশে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, একথা কি শুধু বাঙালির ক্ষেত্রেই খাটে? ইতিহাস বিমুখতা সম্ভবত সমগ্র ভারতবর্ষের অসুখ।

যেসব মহিলা ভারতের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের অন্যতম রামগড়ের রানি অবন্তীবাই। তাঁর সাহস এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব তাঁকে ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই, ওয়ারাঙ্গালের রানি রুদ্রাম্মা দেবী এবং উল্লালের রানি আবাক্কা চৌটার সঙ্গে একই উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু ১৮৫৭ সালের মহাসংগ্রামে রানি অবন্তীবাইয়ের বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকা নিয়ে কতটুকু লেখালেখি হয়েছে? কতজন গবেষক তুলে ধরেছেন এই অসমসাহসী মহিলার কাহিনি?

রানি অবন্তীবাইয়ের জন্ম ১৮৩১ সালে। বিয়ে হলো অধুনা মধ্যপ্রদেশের মান্ডলা জেলার অন্তর্গত রামগড়ের রাজা বিক্রমাদিত্য লোধির সঙ্গে। ছেলেবেলা থেকেই অবন্তী স্বাধীনচেতা। পিতৃগৃহে থাকার সময়েই অসিচালনা, ধনুর্বিদ্যা, অশ্বারোহণ সামরিক কৌশল রচনা ইত্যাদিতে শিক্ষা পেয়েছিলেন। বিয়ের পর সেই শিক্ষা আরও পরিশীলিত হয়েছিল।

যুদ্ধবিগ্রহে রানি এতটাই দক্ষ ছিলেন যে বিক্রমাদিত্য হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার পর রামগড়ের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিতে তাঁর কোনও অসুবিধেই হয়নি। এমনকী রাজার মৃত্যুর পরও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তার অভাব বিন্দুমাত্র অনুভূত হয়নি। কিন্তু ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল অন্য জায়গায়। তৎকালীন ভারতের শাসক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অবন্তীবাইকে রাজা বিক্রমাদিত্যের বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে মানেনি। ১৮৪৮ সালেই বড়লাট ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। প্রণীত হয়েছিল প্রয়োজনীয় আইন। সেই আইনের জোরে ইংরেজ সরকার যেসব দেশীয় রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা যেতেন তাদের রাজ্য কেড়ে নিত।

১৮৫১ সালে ইংরেজ সরকার রামগড় রাজ্যকে 'অভিভাবকহীন' ঘোষণা করল। রানি অবন্তীবাইয়ের জায়গায় সরকার মনোনীত একজন আধিকারিক অভিভাবক নিযুক্ত হলেন। ক্ষুব্ধ অপমানিত রানি সেই ব্রিটিশ অফিসারকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে বিদেশি সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

রানির পরের পদক্ষেপটি নিঃসন্দেহে আধুনিক যুগের যে কোনও মেজর জেনারেলকেও অবাক করে দেবে। তিনি প্রতিবেশী দেশীয় রাজ্যগুলিতে দূত পাঠিয়ে সেখানকার রাজাদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে যোগ দেওয়ার অনুরোধ জানালেন। রাজাদের দেওয়া চিঠিতে রানি লিখেছিলেন, 'যদি মনে করেন পরাধীন মাতৃভূমির প্রতি আপনাদেরও কিছু কর্তব্য আছে তাহলে খোলা তলোয়ার নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। নয়তো মেয়েদের মতো হাতে চুড়ি পরে বসে থাকুন ঘরের কোণে।'

তাঁর অনুরোধে কাজ হয়েছিল। তৎকালীন সেন্ট্রাল প্রভিন্সের প্রতিটি রাজা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন রানির নেতৃত্বে। রানি ৪০০০ সেনা নিয়ে নিজস্ব বাহিনী গঠন করলেন। পরে রানি এবং সেন্ট্রাল প্রভিন্সের দেশীয় রাজ্যগুলির সম্মিলিত সেনাবাহিনী ১৮৫৭-র মহাসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল।

খেরি নামের এক গ্রামে রানি প্রথম ব্রিটিশ বাহিনীর মুখোমুখি হলেন। ভারতীয় সেনার পরাক্রমে পিছু হটতে বাধ্য হলো ব্রিটিশ সেনা। জীবনের প্রথম যুদ্ধেই বড় জয় পেয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলেন রানি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ব্রিটিশ আবার রামগড় আক্রমণ করল। রানির শক্তিকে খাটো করে দেখার ভুল এবার আর তারা করেনি। পূর্ণশক্তির ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে বেশিক্ষণ যোঝা সম্ভব হয়নি রানির পক্ষে। যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে তিনি বাধ্য হন।

কিন্তু লড়াই ছাড়েননি। সম্মুখ যুদ্ধে ব্রিটিশের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তাই তিনি গেরিলা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। আক্রমণ করলেন ব্রিটিশ জেনারেল ওয়াডিংটনের শিবির। কিন্তু ভাগ্য মন্দ। এবারও তাঁকে হার মানতে হলো। পরাজয় নিশ্চিত হবার পর সম্ভবত জীবনে ওই একবারই তিনি ভয় পেয়েছিলেন। ব্রিটিশের হাতে বন্দি হবার ভয়। অতঃপর আর কী! কোষ থেকে তলোয়ার বের করে নিজের বুকে বসিয়ে দিলেন। ব্রিটিশের দেওয়া শাস্তি ভোগ করার থেকে ওই পরিণতি তাঁর কাছে অনেক সম্মানের।

ভারতের ইতিহাসে অবন্তীবাইয়ের স্থান হয়নি। যদি হতো তাহলে ভারতের ইতিহাস আর সমৃদ্ধ হতো। ভারতের নতুন প্রজন্মও অনুভব করত ভারতীয় জাতিসত্তার হৃৎস্পন্দন। ■

প্রখ্যাত সাংবাদিক মুজফ্‌ফর হুসেনের জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি।। প্রখ্যাত সাংবাদিক তথা স্তম্ভলেখক মুজফ্‌ফর হুসেনের জীবনাবসান হয়েছে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি কয়েকদিন অসুস্থ থাকার পর মুম্বইয়ের এক হাসপাতালে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। চার দশকেরও বেশি সময় হিন্দি সাপ্তাহিক 'পাঞ্চজন্য'-এর তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁর লেখা অনূদিত হয়ে স্বস্তিকাতেও দীর্ঘদিন প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখা এতটাই জাতীয়ভাবে উদ্দীপিত ছিল যে, অনেক পাঠক মনে করতেন মুজফ্‌ফর ছদ্মনামে অন্য কেউ লিখছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি, বিশেষত মুসলিম জগতের বিভিন্ন দিকগুলিই তিনি তাঁর লেখায় তুলে ধরতেন।

শ্রী হুসেনের জন্ম ১৯৪৫-এ রাজস্থানের বিজোলিয়াতে। তাঁর পিতা স্থানীয় রাজার চিকিৎসক ছিলেন। রাজাদের শাসন বিলুপ্ত হওয়ার পর তাঁর পরিবার মধ্যপ্রদেশের নিমচে চলে আসেন। বি এ পাশ করে আইন পড়াশোনার জন্য তিনি মুম্বই চলে যান। এই সময় থেকেই তাঁর সাংবাদিকতার জীবন শুরু। মধ্যপ্রদেশে থাকাকালীনই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসেন। জরুরি অবস্থার আগে তাঁর 'কিতনে মুসলিম' নামে একটি লেখা সঙ্ঘের স্বর্গীয় সরসঙ্ঘচালক কে সি সুদর্শনের নজরে আসে। তিনি শ্রী হুসেনকে লেখার জন্য উৎসাহিত করেন। এরপর থেকে তিনি দৈনিক স্বদেশ, পাঞ্চজন্য প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে থাকেন। ইসলামি দুনিয়া নিয়ে তাঁর লেখা পাঠকদের মধ্যে ব্যাপক ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে। হিন্দি, উর্দু, মরাঠি ও গুজরাটি ভাষায় তাঁর বিশেষ দখল ছিল। সোজাসাপটা লিখতেই তিনি পছন্দ করতেন। তিনি মনে করতেন মুসলমানদের হিন্দুদের সঙ্গে একাত্ম হওয়া উচিত। দুই সমাজের উপাসনা পদ্ধতি পৃথক হলেও উভয়েরই পূর্বপুরুষ এক। একজন ইসলামে বিশ্বাসী হয়েও তিনি জেহাদি ভাবনার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি বোহরা সম্প্রদায়ের মুসলমান ছিলেন। তিনি একজন ওজস্বী বক্তা ছিলেন। তাঁর রচিত বইগুলির অন্যতম হলো ইসলাম অউর শাকাহার, অল্পসংখ্যকবাদ কে খতরে, মুসলিম মানস। রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের কাজে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। ২০০২-এ তিনি 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে সম্মানিত হন। স্বস্তিকা পরিবারও কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে তাকে সংবর্ধনা জানায়। তাঁর স্ত্রী নফীসা হুসেনও একজন সমাজকর্মী। তাঁর মৃত্যুতে দেশ এক সুসন্তানকে হারাল।

পরলোকে সঙ্ঘ-গণবেশ তৈরির কারিগর মৃত্যুঞ্জয় কর্মকার

সদাহাস্যময়, অত্যন্ত মৃদুভাষী একজন পুরানো অনুভবী সবার প্রিয় হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার স্বয়ংসেবক মৃত্যুঞ্জয় কর্মকার গত ১৭ ফেব্রুয়ারি লোকান্তরিত হলেন। স্বয়ংসেবক হিসেবে সারা জীবন অন্যান্য সেলাইয়ের সঙ্গে সঙ্ঘের গণবেশ তৈরির কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। অনেক সময় হাসতে হাসতে বলতেন, 'আমার জীবন ধন্য যে, সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় অধিকারী থেকে সাধারণ স্বয়ংসেবক পর্যন্ত সবার গণবেশ তৈরি করার সুযোগ আমাকে মনে হয় স্বয়ং ডাক্তারজীই করে দিয়েছেন। একজন ক্ষুদ্র মানুষ হয়ে সঙ্ঘের বৃহৎ কাজে নিযুক্ত থাকতে পেরে গর্ব অনুভব করি।'

শুধু সঙ্ঘের গণবেশ তৈরির মধ্যে সীমিত না থেকে নিজেকে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। নিয়মিত ভাবে প্রতি বৃহস্পতিবার কলকাতায় আসবেন সবাই জানতেন। কারো পাঞ্জাবি, পাজামা, ফতুয়া, আন্ডারওয়ার তৈরি করতে হবে তো মৃত্যুঞ্জয়দা হাজির। একবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি না মেপেই পাঞ্জাবির কাপড় নিয়ে যাচ্ছেন, বানাবেন কী করে? সহাস্য উত্তর— আপনার গায়ের মাপ আমার এই টিকুজিতে সব লেখা আছে।

সবার প্রিয় মৃত্যুঞ্জয়দা অজাতশত্রু ছিলেন। সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল। নিজের পাড়ার লোক, গ্রামের ও ব্লকের সকলের কাছে তিনি দরজিকাকা, দরজিজ্যাঠা, দরজিদাদা বলেই পরিচিতি ছিলেন। এক কথায় তাঁর সরল জীবনযাপন তাঁকে মানুষের কাছে প্রিয় করেছিল। সঙ্ঘের খণ্ড কার্যবাহ, বৌদ্ধিক প্রমুখের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। দুরারোগ্য মারণব্যাধি তাঁকে আক্রমণ করেলেও কাউকে বুঝতে দেননি। এমন কী বাড়ির লোককেও নয়। লুকিয়ে শুধু ওষুধ ব্যবহার করতেন। অবশেষে সামলাতে না পেরে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নার্সিংহোমে ভর্তি হলেন। তখন উলুবেড়িয়া বিধান সভার ভোট। যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, বলেছেন— একটি ভোট কেউ যেন নষ্ট না করে। হিন্দু ভোট যাতে একটিও নষ্ট না হয় তার জন্য নিজে নার্সিংহোম থেকে গাড়ি করে এসে ভোট দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত আর পারলেন না, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ৬৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, এক কন্যা এবং অগণিত স্বয়ংসেবক ও বন্ধু-বান্ধব।

রঙ-বেরঙের পাখির দ্বীপ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় একটি দ্বীপের মধ্যে একটি জঙ্গল। নাম 'প্যারট জঙ্গল'। সেখানে খোলা আকাশের নীচে বাঁধনহীন ভাবে উড়ে বেড়ায় নানা প্রজাতির পাখি। তাদের কত রঙের বাহার। প্রত্যেকে যেন বিশ্বসুন্দরী। আমরা সাধারণত পাখি দেখি খাঁচা অথবা চিড়িয়াখানায়। কিন্তু এখানে কোনও পাখি খাঁচায় থাকে না। সবাই মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়ায়। এমনকী এখানকার সব পাখিই শিক্ষিত। সবাই স্কুলে পড়ে। স্কুলে তাদের শেখানো হয় কীভাবে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে, কীভাবে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানতে হবে। অতিথিরা গেলে তাদের মজার মজার খেলা দেখাতে হবে। পাখিদের জন্য এরকম একটি মুক্ত জায়গা তৈরির কাজ শুরু করেন ফ্রানজে স্কার নামে এক ব্যক্তি। তিনি একজন পাখিপ্রেমী ছিলেন। তাঁর ভাবনায় ছিল পাখিদের জন্য একটা এমন জায়গা বানালে কেমন হয় যেখানে তারা স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়াবে, আবার মানুষের কাছাকাছিও থাকবে। ফ্রানজের এই কথা শুনে প্রথমে অনেকে হেসেছিল, কিন্তু ফ্রানজে দমে না গিয়ে ১৯৩৬ সাল থেকে এই কাজে হাত দেন। মাত্র ২৫টি পাখি নিয়ে তিনি শুরু করেন তাঁর এই প্যারট জঙ্গল। এখন সেখানে প্রায় ১১০০ প্রজাতির পাখি ও ২০০০ প্রজাতির গাছপালা রয়েছে। এই দ্বীপে ঢুকলেই চোখে পড়বে রঙ-বেরঙের নানা প্রজাতির টিয়াপাখি। তাদের কলরবে মুখরিত চারিদিক। অধিকাংশ পাখিই কথা বলতে পারে। জায়গাটি অনেকটা চিড়িয়াখানার মতো হলেও এখানে অন্য কোনও জন্তুজানোয়ার নেই। এখানে কেবল পাখিদের বাস।

অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় কাকাতুয়া ব্ল্যাক পাম আছে এখানে। এদের ঠোঁট কাকাতুয়াদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা। এই কাকাতুয়া দেখে মনে হয় যেন মুখ ভ্যাঙাচ্ছে।

এখানকার আরও একটি বড় আকারের পাখি হলো স্কারলেট ম্যাকাও। এরা সাধারণত মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় থাকে। তিন ফুটের বেশি লম্বা গায়ের পালকগুলি উজ্জ্বল লাল, হলুদ আর নীল রঙের। অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে হয় এই সুন্দর পাখিগুলির দিকে।

স্কারলেটের মতো আরও একটি রঙিন পাখি হলো বুল-গোল্ড ম্যাকাও। এদের পীঠের রঙ শরৎকালের আকাশের মতো নীল, পেটের দিকের রঙ উজ্জ্বল সোনার মতো হলুদ। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এরা রেগে গেলে কিংবা লজ্জা পেলে নিজের রঙ বদলে ফেলে। এদের কাছে গিয়ে কথা বললে এরা মানুষের স্বর নকল করে কথা বলতে পারে। এই বুল-গোল্ড ম্যাকাওগুলি দলবেঁধে থাকতে ভালবাসে।

একজন পর্যটক তো অবাক হয়ে গিয়েছিলেন একটি পাখির কীর্তি দেখে। তিনি গিয়েছিলেন দোকানে নারকেল কিনতে। দোকানের পাশে একটি পাখি বসে ছিল। দোকানদার নারকেলটি পাখিটিকে দিল আর পাখিটি তার ঠোঁট দিয়ে নারকেলটি ফাটিয়ে দিল। সেই পাখিটির নাম ছিল হায়াসিন্থ ম্যাকাও। রাজকীয় চেহারা। গোটা শরীর নীল রঙের পালকে ঢাকা। কুচকুচে কালো ঠোঁট। ঠোঁটের কাছে এক চিলতে হলদে। এই পাখিটি সাড়ে তিন ফুট লম্বা হয়। ডানা মেললে চার থেকে পাঁচ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। প্রায় একটি মানুষের সমান।

আগেই বলেছি, এখানকার পাখিরা সবাই শিক্ষিত। এমু, ময়ূর, বাজপাখি অতিথিরা এলে তাদের সাইকেলে চেপে ব্যালান্সের খেলা দেখায়। এছাড়াও এখানে আছে পেঙ্গুইন, ক্যাসোওয়ারিস, টর্কি-সহ নানা প্রজাতির পাখি।

ভারতের পথে পথে

গড় পঞ্চকোট

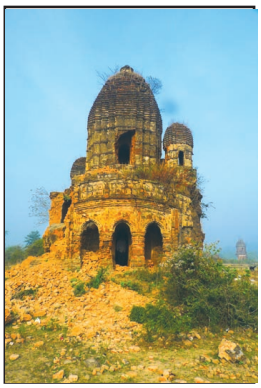

পুরুলিয়ার একটি প্রত্নস্থল হলো গড় পঞ্চকোট। পঞ্চকোট পাহাড়ের কোলে অবস্থিত এই জায়গাটি ওখানকার শিখর রাজবংশের রাজধানী ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে এক সময় সেখানে পাঁচ মাইল বিস্তৃত একটি দুর্গ ছিল। বারো বর্গমাইল পরিখা দিয়ে ঘেরা ছিল সেই দুর্গ। ১৮৭২ সালে এক ঐতিহাসিক পঞ্চকোট ভ্রমণ করে চারটি দুয়ার বা তোরণের বর্ণনা দিয়েছেন। যেগুলির আর কোনো চিহ্ন নেই। গড় পঞ্চকোটের অধিকাংশ স্থাপত্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে কেবল কয়েকটি মন্দির রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো টেরাকোটা নির্মিত পঞ্চরত্ন মন্দির। মন্দিরের গায়ে ফুল, আলপনা ও খোল, করতাল বাদনরত মানব-মানবীর মূর্তি খোদিত আছে। মন্দিরের ভিতর কোনো মূর্তি নেই। মন্দিরের চূড়াটি প্রায় ষাট ফুট উঁচু। এছাড়াও গড়ের পশ্চিম দিকে রয়েছে কঙ্কালীমাতার প্রস্তর নির্মিত ভগ্নপ্রায় মন্দির। পুরুলিয়ার পর্যটন মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে এই গড় পঞ্চকোট।

জানো কি?

আন্তর্জাতিক সীমানা স্পর্শকারী ভারতীয় রাজ্য—

- জম্মু-কাশ্মীর, পঞ্জাব, গুজরাট ও রাজস্থান— পাকিস্তানের সীমায়।
- সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরাখণ্ড ও উত্তরপ্রদেশ—নেপাল।
- সিকিম, অসম, পশ্চিমবঙ্গ ও অরুণাচল— ভুটান।
- জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল, উত্তরাখণ্ড, সিকিম ও অরুণাচল— চীন।
- পশ্চিমবঙ্গ, অসম, মিজোরাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা— বাংলাদেশ।
- মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল— মায়ানমার।

ভালো কথা

বাড়ির সংস্কার

স্কুল ছুটির পর মাধব বাড়ি ফিরছিল। রাস্তার ধারে দেখতে পেল একটি ছেলে ধুলোয় বসে কাঁদছে। পায়ে খুব চোট পেয়েছে। রক্ত ঝরছিল। মাধব ছেলেটিকে নিয়ে বাড়ি এল। বাড়িতে মা ছিলেন। তিনি ছেলেটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ক্ষতস্থানে মলম লাগিয়ে দিলেন। কিছু খেতে দিলেন। ছেলেটি হাসিভরা মুখ নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। পরে মা জানতে পারলেন ছেলেটি মধুর বন্ধু বা সহপাঠী নয়। রাস্তায় বসে কাঁদছিল তাই মধু বাড়ি নিয়ে এসেছিল। মা বললেন, 'ঠিক করেছ, এই তো চাই। দীন-দুঃখীর সেবা করা মানুষের পরম কর্তব্য।' এই মাধব হলেন সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী। তিনি মায়ের কাছে এই সংস্কার পেয়েছিলেন। এটি শাখার এক দাদার মুখে শোনা।

অনুপম বেরা, একাদশ শ্রেণী, সিপাই বাজার, মেদিনীপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) না বি বি চা বে র	(১) ধি ব্যা বি ক ণ র
(২) দ বা বি ং স দ	(২) ণ ম র ঙ্গ লা চ

৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) রামচরিতমানস (২) যেনতেনপ্রকারেণ

৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) রঘুকুলশিরোমণি (২) ব্রহ্মচর্যপরায়ণ

উত্তরদাতার নাম

(১) রূপষা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯। (২) শঙ্খশুভ্র দাশ, সোনারপুর, দ: ২৪ পরগনা। (৩) সৌরিন কেশ, তুলসীডাঙ্গা, বর্ধমান। (৪) প্রীতম দেবনাথ, তপন, দ. দিনাজপুর।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

SURYA FOUNDATION

B-3/330, Paschim Vihar, New Delhi - 110063
Tel. : 011-25262994, 25253681
Email : suryainterview@gmail.com Website : www.suryafoundation.net.in

Surya Foundation is a renowned organisation for imparting training to the youth for their all-round development. We require dedicated & diligent young boys brought up in a sound SANGH culture with impeccable character and devotion to social work for the following categories :

1. **Graduate Management Trainee (GMT)**

   Qualifications. Boys who have passed class 10th or 11th or 12th may apply. Should have secured minimum 60% aggregate marks with 75% marks in Maths in the previous class.

   Age. Below 18 years.

   Selected candidates will be imparted 6 months initial training at Surya Foundation Training Campus Jhinjholi prior to the On Job Training (OJT) or Practical Campus Training (PCT). Facilities for doing graduation and MBA or MCA will be provided during OJT / PCT.

   Free accommodation, food and stipend of Rs. 3,000/- p.m. will be provided during the period of 6 months initial training.

   During the OJT / PCT, besides free accommodation and facilities for education, stipend of Rs. 6,000/- p.m. in class 11th, Rs. 7,000/- in class 12th, Rs. 9,000/- in 1st year graduation, Rs. 10,500/- in 2nd year graduation, Rs. 12,000/- in 3rd year graduation, Rs. 15,000/- during MBA / MCA 1st year and 20,000/- in MBA / MCA 2nd year will be given. Salary Rs. 30,000/- p.m. (CTC) will be given on completion of MCA / MCA.

2. **Assistant Staff Cadre (ASC)**

   Qualifications. Boys who have passed class 10th or 11th or 12th may apply. Should have secured minimum 55% aggregate marks with 60% marks in Maths in the previous class.

   Age. Below 18 years.

   Selected candidates will be imparted 6 months initial training at Surya Foundation Training Centre Jhinjholi prior to OJT / PCT for three years.

   Free accommodation, food and a stipend of Rs. 3,000/- p.m. will be provided during the six months initial training.

   During the OJT / PCT, besides free accommodation stipend Rs. 7,000/- p.m. for 1st year, Rs. 8,500/- p.m. for 2nd year and Rs. 10,000/- p.m. for 3rd year will be paid.

   On completion of OJT / PCT salary of Rs. 13,000/- (CTC) will be given.

Application Form

(Apply on a separate sheet of paper)

Affix latest Photograph here

Category 1 / 2 (Indicate the category apply for)

Full Name (In Capital) _____ Date of Birth _____ Caste _____ Married / Single __

Father's Name _____ Father's Occupation _____ Monthly Salary _____

Brothers (Excluding Self) _____ Sisters _____

Educational Qualification_____ (Attach Photocopy of Marksheet)

Have you attended NCC/NSS/OTC/ITC/Sheet Shivir? Give Details of location of Camp and dates _____

Were you associated with Seva Bharati / Vidya Bharati / Vanvasi Kalyan Ashram / Any other Sangh Project? Give details.

Is anyone known to you in Surya Family? Give his name and department _____

Have you ever been Interviewed in Surya Foundation? If yes, give Year and Cadre for which Interviewed. _____

Address for Correspondence _____ Pincode _____ Phone No. _____ Mobile _____ Email _____

Give details of any special achievements, qualifications etc.

Apply with detailed biodata at the following address. Applicants for 'Category 1' should also send their detailed CV along with the application.

Surya Foundation, B-3/330, Paschim Vihar, New Delhi - 110063

Apply within one month of the publication of the advertisement

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
12 March - 2018 - Rs. 10.00

SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@sroshni.com I www.surya.co.in
Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96
Toll Free No.: 1800 102 5657
/suryalighting I /surya_roshni

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা।।